পঞ্চম অধ্যায়

উপন্যাসের ভাষা

পঞ্চম অধ্যায়

উপন্যাসের ভাষা

উপন্যাসকে বলা হয় কথাসাহিত্য। এই 'কথা' বলার বা লেখার একমাত্র অবলম্বন ভাষা। ভাষার আধারেই সাহিত্য মূর্তি লাভ করে। ভাষা ব্যতীত সাহিত্যের কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। ''প্রকৃত (সিরিয়াস) সাহিত্যরূপে উপন্যাস রচনাকালে প্রকাশের মাধ্যম, ভাষা সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সজাগ মনস্কতার একান্ত প্রয়োজন, যেহেতু ভাষার শৈথিল্য ও অসুষ্ঠুপ্রয়োগ ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা শিল্পায়নের পরিপন্থী হয়।''- ১। সেইজন্য কোন সাহিত্যিকের সাহিত্যকৃতি আলোচনা করার সময় তাঁর সাহিত্যের ভাষার আলোচনা করতেই হবে। বিশেষতঃ সে সাহিত্য যদি উপন্যাস হয়। ''উপন্যাসের ভাষা উপজীব্য ও উপস্থাপনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।''- ২।

বিভিন্ন উপন্যাসের ভাষা আলোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন বাঙালী ঔপন্যাসিক উপন্যাসে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা একই বাংলাভাষা হয়েও তার স্ট্রাকচার বা নির্মিতি সব সময় এক নয়। এই পার্থক্য কালের দিক থেকেও বটে, আবার স্টাইলের দিক থেকেও বটে; আবার বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনেও বটে। যে কোন শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের ভাষাস্টাইল স্বতন্ত্র। কেউ সাধু ভাষায়ই সমগ্র উপন্যাস রচনা করেছেন - কেউ ব্যবহার করেছেন চলিত ভাষা। কোন কোন লেখক উপন্যাসকে বাস্তবনিষ্ঠ করার জন্য উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রকে চরিত্রোপযোগী ভাষায় কথা বলিয়েছেন - তার ফলে উপন্যাসে কথ্য, সাধু, চলিত সব ভাষাই যুগপৎ ব্যবহৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গ পর্যন্ত সব উপন্যাসে সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের সব চরিত্রেরই মুখের ভাষা এক এবং সে ভাষা রবীন্দ্রনাথের ভাষা। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে রাজা গোবিন্দ মাণিক্য, পুরোহিত রঘুপতি এবং রাজার অনুচর সকলে শিক্ষিত, কবি এবং ভাষা কুশলী রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলেছে -

> রাজা বলিলেন, 'এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না !'
> চোন্তাই রঘুপতি বলিলেন, 'আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি .'
> [এ দেশে পুরোহিতকে চোন্তাই বলিয়া থাকে ।]
> রাজা বলিলেন, 'না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে । ... - ৩।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কথোপকথন এবং বর্ণনার ভাষাও এক,উদাহরণ -

> ময়ানি নদীর ধারে মহারাজ কুটীর বাঁধিয়াছেন । স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্রনদী ছোটো বড়ো শিলাখণ্ডের উপর দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছে । দুই - পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় খাড়া হইয়া আছে, কালো পাথরের উপর বিচিত্র বর্ণের শৈবাল ঝুলিতেছে, মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো গহ্বর আছে, তাহার মধ্যে পাখি বাসা করিয়াছে । - ৪।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনী শিক্ষিতা, আশা অশিক্ষিতা; কিন্তু সংলাপে উভয়ের ভাষা একই । যেমন -

> আশা উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিত 'এবার যাই ভাই চোখের বালি, তিনি আবার রাগ করিবেন ।' বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বলিত, ''রোসো, এইটুকু শেষ করিয়া যাও । আর বেশী দেরী হইবে না ।'
>
> খানিকবাদে আশা আবার ছটফট করিয়া বলিয়া উঠিত, 'না ভাই, এবার তিনি সত্য সত্যই রাগ করিবেন - আমাকে ছাড়ো, আমি যাই ।' বিনোদিনী বলিত, 'আহা একটু রাগ করিলই বা । সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালোবাসার স্বাদ থাকে না - তরকারিতে লঙ্কা মরিচের মতো । - ৫।

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে কোন ঘটনা বর্ণনায় সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন । কথোপকথনে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ আছে । প্রধান এবং অপ্রধান সব চরিত্রের মুখের ভাষাও এক । বঙ্কিমচন্দ্রের

উপন্যাসের ভাষা সাধু হয়েও সে গদ্য - বাংলা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের গদ্য থেকে শব্দ যোজন ব্যবধান রচনা করে । কোন কোন ঔপন্যাসিক আবার উপন্যাস রচনায় কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের ধ্যানধারণা, সংস্কার, রীতিনীতি, জীবনাচরণকে বিধৃত করার জন্য সেই অঞ্চলের মানুষের বা গোষ্ঠীবিশেষের কথ্য ভাষাই তাদের কথোপকথনে ব্যবহার করেছেন । এই ভাষা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দেখা যায় আঞ্চলিক উপন্যাসে । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । বিষয়ানুসারী ভাষা গ্রহণ উপন্যাসকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে অন্বিষ্ট করেছে -

> বউ বললে - কি ?
> - শিঁপড়ে ।
> অসংখ্য শিঁপড়ে গর্তটার ভিতরে বিজবিজ করছে ।
> অধিকাংশের মুখে ডিম ।
> বউ বললে - আহা, দেখে চলতে হয় ! ডিম নিয়ে কেমন আকুলি-বিকুলি করছে দেখ দি-নি ।
> তোর মাথা । বনওয়ারী এদিক ওদিক চেয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে একটা শিঁপড়ের সারি দেখিয়ে বললে - ওই দেখ্। অনেকক্ষণ থেকে ওরা পালাতে লেগেছে এখান থেকে । তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বললে - জল ঝড় পেচণ্ড একটা হবে লাগছে ?
> - জল ঝড় হবে ?
> - পেচণ্ড ?
> - পেচণ্ড ?
> - হ্যাঁ শিঁপড়েতে জানতে পারে । বর্ষায় দেখিস না যেকে থেকে দ্যালে বাসা করে ? - ৬।

উক্ত সংলাপে 'হাঁসুলি বাঁকে'র কাহারদের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে । 'হবে লাগছে' - ত্রি-য়াপদের এই ধরণের ব্যবহার লক্ষণীয় । বাংলা ভাষার সাধারণ বাক্যরীতিতে ঠিক এমনটি বলা হয় না । ত্রি-য়াপদের বৈশিষ্ট্য

ছাড়াও ভাষার অন্য আবেদন আছে ।

> পাগল বললে - তা হ'লে ওঠো আজকের মত । উদিকে আকাশের গতিকও মন্দ হে । পশ্চিমে চিকুরছে, বাতাস খুব ধরেছে । আজ চারপাঁচদিন দেবতা হাঁকাড় দেন নাই । আজ বোধ হয় এতে আসবেন বা । - ৭।

বিশেষ জনপদের অধিবাসীদের (কাহারদের) সংস্কার, কুসংস্কার, চিন্তাভাবনা এমন সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে শুধু উপভাষার আশ্রয়ে প্রকাশ করার জন্যই । 'এতে' শব্দের দ্বারা 'রেতে' অর্থাৎ রাতে বোঝানো হয়েছে । আবার উপন্যাসের যে অংশে বর্ণনা - সেখানে লেখক নিজের ভাষা - সাহিত্যের ভাষা- যে ভাষায় ''ভাষা ধারণার প্রাচীনতাকে মেনে ধরে'' সেই ভাষা ব্যবহার করেছেন । এ প্রসঙ্গে আশিসকুমার দের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য - ''তারাশঙ্কর দেশী বা উপভাষা শব্দ বেশী থাকলেও বর্ণনায় তিনি তৎসম শব্দকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন । সংলাপে তাঁর কথ্য ও প্রচলিত জনভাষায় দখল বিস্মিত করলেও বর্ণনায় ভাষাধারণার প্রাচীনতাকে মেনে ধরে ।'' -৮। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত গদ্যাংশটুকু উদ্ধৃত করা হল ।

> বাঁশবাদির বাঁশবনে আজও জমে আছে আদিম কালের অন্ধকার । সে অন্ধকার রাত্রে এগিয়ে এসে বাঁশবাদির কাহারপাড়াকে আচ্ছন্ন করে । সেই অন্ধকারের মধ্যেও কাহারদের দৃষ্টি কিন্তু ঠিক চলে ; ওদের চোখে তখন জেগে ওঠে সেই আদিম যুগের অর্থাৎ অগ্নি আবিষ্কারের পূর্বযুগের মানুষের চোখের অন্ধকার - ভেদী আরণ্যজন্তুর দৃষ্টিশক্তি- ৯।

কোথাও কোথাও অবশ্য কাহারদের ভাষায়ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । কোন কোন আধুনিক ঔপন্যাসিক যেমন -মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস রচনায় ''উপন্যাস ভাষার সাধু -চলিতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘটিয়ে এক মিশ্র রীতি অনুসরণ করেছেন ।''- ১০। দৃষ্টান্ত -

> গোঁয়ার সহজ কুবের ! গোঁ ধরিলে আরতো সে তাহা ছাড়িবে না । যেজোবুর নৌকায় মালা যে আশ্বিনবাড়ি গিয়াছিল, কতকাল সে একথা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিবে সেই জানে, হয়তো যখন বুড়ি হইয়া যাইবে .....তখনও একথা ভুলিবে না কুবের । ..... এ বিষয়ে কুবের কঠোর, নির্মম । অন্য বিষয়ে মালার সঙ্গে তাহার ব্যবহার বদলায় না, পঙ্গু, অসহায় স্ত্রীর জীবন তারই বক্ষের আশ্রয়ে আজো উথলিয়া ওঠে , কিন্তু আশ্বিন বাড়ি যাওয়ার জন্য অম্লানবদনে মালাকে সে পীড়ন করে । .....এমনি প্রকৃতি পদ্মানদীর মাঝির , ভদ্রলোকের মত একটানা সংকীর্ণতা নয় , বিরাট বিস্তারিত সংশ্লিষ্ট । - ১১।

ভাবের সঙ্গে ভাষার সুসমঞ্জস মিলনে উপন্যাসের সার্থকতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় । ভাব ও ভাষার সঠিক সমন্বয়ে বাংলা প্রবচন তার বিশেষ ভাষাভঙ্গী - সহ কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত -

> সনকা ছেলের ভাব -ভঙ্গী লক্ষ্য করিল, আজই যে উজ্জ্বলা তার স্বামীর উদ্দেশ্যে নূতন মন্ত্র করিয়াছে, সে কথা বুঝিতে বাকি থাকিল না । একেবারে হতাশ হইয়া কপালে ঘা মারিল, - ''মরেছিস ভীমে ! কালামুখী তোরে দাঁতে চিবিয়ে খেয়ে ফ্যালাইছে / রাত -বিরাতে তোর পরুরানী বৌকে আমি জলকে পাঠাই ? কি অধর্মুরে তোরা ? বলে -
> 'নিয়র পোখরি দূরকে যায়,
> পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায়,
> পর সম্ভাষে বাটে থিকে, -
> এ নারী কখন ঘরে না টিকে ।' -
> তার চেয়ে আমার কথাটা নে, এখনও যানে যানে ওরে ছেড়ে দে । - ১২।

আর এক জায়গায় অনুরূপা দেবী লিখেছেন -

সেদিন রবিবার । তখন দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম অবসর । শেষা যাঘের স্নিগ্ধ রৌদ্রে শীতক্লিষ্ট দেহ মেলিয়া দিয়া পথের উপর কুকুরগুলা শুইয়া পড়িয়াছে ; পথের ধারে খোলার ঘরে দোকানী প্রচুর পরিমাণে মুড়ি ছোলার চাক্তি ও মকাই ভাজা সাজাইয়া বসিয়া দুলিতেছে ; কোথাও যাঁতায় গম পিষিতে পিষিতে লজ্জাশীল কুটিরবাসিনীগণ ঘোমটার মধ্য হইতে সমস্বরে -

''বাসিয়া ভাত কাঠালকে কোয়া ;
খা লেও বউয়াকে বাবা,
হায় যাড়ের তামাশা দেখে, -
কে পাকাতো তাজা ভাত ?'' -

ইত্যাদি পতিভক্তি-সূচক সঙ্গীতে গলা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন । - ১২(ক)।

এই ধরণের ছোট্ট এক টুকরো গ্রাম্য ছড়ার মধ্য দিয়ে বিহারের কোন সুদূর গ্রামের মাঘ মাসের নরম রোদে কর্মরত পল্লীবাসিনীগণের সমবেত আনন্দ-ধ্বনি আমাদের মনের দরজায় গুঞ্জন তোলে - মন উদাস হয়ে যায় ! এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল হিন্দীতে এই 'উদাস' শব্দটি ব্যাপকার্থক । 'আরণ্যক' উপন্যাসের ভূমিকায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দটির খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন । '' রাজু বলিল - যুদ্ধের আপনি চলে গেলে লবটুলিয়া উদাস হয়ে যাবে । প্রসঙ্গত-যে বলি এদেশে 'উদাস' শব্দের ব্যবহার এবং উহার অর্থের ব্যাপকতা অত্যন্ত বেশী । মকাইভাজা খাইতে খারাপ লাগিলে বলে, 'ভাজা উদাস লাগছে'। আমার সম্পর্কে কি অর্থে উহা ব্যবহৃত হইল ঠিক বলিতে পারিব না ।'' - ১২ (খ)। অনুরূপা দেবীর '' মাজঙ্গী'' উপন্যাসে উদাস শব্দের ব্যবহার দেখা যায় । '' ..... একদিন হঠাৎ যেমন এসেছিলেন, তেমনিই কোথায় যে উদাস হয়ে চ'লে যান, তার পাত্তাই লাগে নাই ।'' - ১৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ প্রত্যেকেই 'উদাস' - শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং বিভিন্ন অর্থে ।

'' পদ্মানদীর মাঝি'' উপন্যাস চরিত্রকেন্দ্রিক, আঞ্চলিক উপন্যাস নয় ।

শুধু এর চরিত্রকে পূর্ণ বিকশিত করতে, জীবনযাত্রার সঙ্গে চরিত্রকে যুক্ত করতে, চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করতে ঔপন্যাসিক পদ্মানদীর মাঝিদের কথ্য ভাষা, সংলাপে ব্যবহার করেছেন । যেমন -

> কুবের বলিল, হ, ন যাই ? আইচ্ছা, তুই ক দেখি গণেশ, হীরুজ্যাঠার ঠাঁই দুশা ছন চায়্ নাকি ? দিবনা ?
> গণেশ বলিল, হীরুজ্যাঠা ছন দিব ? জ্যাঠারে তুই চিনিস না কুবির, কাইলের কাণ্ড জানস ? বিহানে ঘরে ফির‍্যা শুমু, বউ কয় চাল বাড়ন্ত। .....বৌরে কইলাম, হীরুজ্যাঠার ঠাঁই দুশা চাল কর্জ আনশা দুপুরে গাঁয়ে গিয়া কিনা আনুম । কলি না শিখ্যায় যাবি কুবির বৌরে জ্যাঠা ফিরাইয়া দিল । কয় কি, বিষ্যদবার কর্জ দেওন যানা । - ১৪।

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় কাহারদের ভাষা, 'পদ্মানদীর মাঝি'র পূর্ববঙ্গীয় বঙ্গালী ভাষা, 'ত্রিবেণী' উপন্যাসের বাংলাভাষা বা সুবোধ ঘোষের' শতকিয়া'র সংলাপের ভাষা - সবই বাংলা ভাষা । অথচ লহেদে ধ্বনিগত পার্থক্যের জন্য পৃথক মনে হয় ।

উপন্যাসের সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রেখেই লেখক ভাষা বা ভাষারীতি নির্বাচন করেন । উপজীব্য বিষয়ানুসারে ভাষা সৃষ্টি শিল্প - সফলতাকে অনেক অনেক উচ্চতায় স্থাপন করতে পারে । এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য স্মরনীয় - ''অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনু - সারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত ।''- ১৫।

আঞ্চলিক উপন্যাসের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে । প্রয়োজনানুসারে বিশেষত: চরিত্রকে বাস্তবনিষ্ঠ করার জন্য প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব বা উপভাষার প্রভাবও ঔপন্যাসিক-কে স্বীকার করে নিতে হয় । আবার বিশেষ জনপদের জীবনধারা, জীবনসংগ্রামের গতিপ্রকৃতি, জনসাধারণের সংস্কার - কুসংস্কার বিধৃত করা সত্ত্বেও লেখক উপন্যাসিক আবহাওয়া সৃষ্টি এড়িয়ে যান - চরিত্রকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা সার্থক করার জন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''পদ্মানদীর মাঝি''র কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে ।

আবার একই উপন্যাসের বিভিন্ন অধ্যায় রচনায় ভাষার বিভিন্নতাও দেখা যায়। যেমন - সতীনাথ ভাদুড়ীর ''জাগরী'' উপন্যাসের চারটি অধ্যায়ের ভাষা - কৌশলের পার্থক্য। এ সম্পর্কে শংকর ঘোষের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

> পরিশেষে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে বলতেই হয়, তা হল, মায়ের অধ্যায়টিতে লেখক ব্যবহার করেছেন মুখের ভাষা অর্থাৎ চলিতভাষা অথচ অপর তিনটি অধ্যায়ে ব্যবহার করেছেন সাধুভাষা, খুব সচেতন - ভাবেই। - ১৬।

আধুনিককালে অনেক ঔপন্যাসিকই উপন্যাসকে 'মাটির কাছাকাছি' পৌঁছে দেওয়ায় আগ্রহী। সে কারণে তাঁরা ভাষা ব্যবহারে খুব সতর্ক এবং মনোযোগী। সার্থক উপন্যাস সৃষ্টিতে নারীভাষারও বিশিষ্ট স্থান আছে। নারীভাষার যথাযথ প্রয়োগের কথাও ঔপন্যাসিককে ভাবতে হয়। উপন্যাসের ভাষাশৈলীর এও শেষ কথা নয়। '' উপন্যাসে দ্বিতীয় ভাষার (সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ) প্রয়োগও একটি লক্ষণীয় বস্তু।'' - ১৭। বিহার - প্রবাসী বাঙালী লেখকদের রচনায় দ্বিতীয়ভাষা হিসেবে হিন্দীর ব্যবহার প্রায় অবধারিত - বিশেষ করে গীত বা গানে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত উপন্যাসে সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন, এমন কি কথোপকথনেও। তিনিও তাঁর ''দরিয়া'' উপন্যাসে হিন্দী গানের কলি উদ্ধৃত করেছেন।

> এই বলিয়া দরিয়া নূপুরের ঝঙ্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং
> '' চুনী চুনী কলিয়াঁ মলিয়াঁ বানাওয়ে
> আরে রে যৌবন ধন মত্তচোল রাঙ্গাওয়ে''
> এই টপ্পা গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে ন্যুব্জ কুব্জ হইয়া হাত দুইটি বিস্তারিত করিয়া চুলভরা মাথা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, কোমর দুলাইয়া দুলাইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। - ১৮।

আর এক জায়গায় তিনি লিখছেন -

> অনেকগুলি নরনারী কাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কি শুনিতেছে। শুন, শুন, এই কোটী কণ্ঠের গুঞ্জন ঝংকারকে স্তব্ধ করিয়া কাহার কণ্ঠস্বর ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, গলার আওয়াজটা যেন একটু চেনা, যে শুনিতেছে সেই বলিতেছে, আহা কি মিঠিয়া আওয়াজ, গানের কি কর্ত্তব্য এমনও শুনি নাই। একটু কান পাতিয়া শুন দেবী কি গান গাহিতেছে। গানের একটি কলিই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে -
> কাযনা ছোড়ও নেহী হায় নাথ কেয়া করে। -১১।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের কিছুটা সময় বিহারে কাটিয়েছেন। তাঁর লেখায় বিহারের প্রকৃতি ও মানুষের অল্পই প্রভাব দেখা যায়। তবু কোন কোন উপন্যাসে বাস্তবনিষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ -মানসেই হোক বা অভ্যাসের প্রভাবেই হোক হিন্দীভাষায় সংলাপ রচনা এড়াতে পারেন নি। যেমন -

(১) ''সাধুজী খুশী হইয়া বলিলেন - হাত তেরা সাচ্চা হ্যায়। আচ্ছা বেটা রামজীকা খুশী।'' -২০।

(২) ''..... বোধ করি এ যজ্ঞের যজমান তিনিই। বলিলেন, আইয়ে বাবুজী, বৈঠিয়ে; বলিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন।'' - ২১।

উপন্যাস আখ্যানমূলক সাহিত্য। এই আখ্যান মানুষের আখ্যান। মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, জীবণাচরণ, সুখদুঃখ সব কিছুই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় -তাদেরই এসবের সঙ্গে মানুষের অন্বয় ঘটিয়ে আখ্যানকে করে তোলে শিল্প। সেই কারণে যথোপযুক্ত- উপস্থাপনার জন্য সঠিক পদ্ধতির সঙ্গে সঠিক ভাষাপ্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। বিহারবাসী বাঙালী লেখকগণ তাঁদের রচিত বাংলা উপন্যাসে হিন্দী ভাষাকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। উপযুক্ত- হিন্দী শব্দের দ্বারা এসব উপন্যাসের বাংলা খচিত হওয়ায় বিহারের জীবন-পটভূমি মূর্ত হয়ে ওঠে। আমার আলোচনার তালিকাভুক্ত- ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের সাহায্যে এবার সেই সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এর আগের অংশটুকু প্রাসঙ্গিক ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে ।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত উপন্যাস রচনায় হিন্দীভাষা খুবই কম ব্যবহার করেছেন । কিন্তু যেটুকু সংলাপ হিন্দীতে রচনা করেছেন, তার দ্বারা ভিন্ন পটভূমির পরিবেশ অনুভব করা যায় । 'ফুলশাহ' চরিত্রটি চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে । তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় ভাষার অবদানই বেশী । নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'অমরসিংহ' উপন্যাসে এক জায়গায় যুদ্ধকালীন খাদ্য সংগ্রহের প্রসঙ্গে কুমারসিংহ ও তাঁর বন্ধুর উক্তি- -প্রত্যুক্তি- -

> এত অল্প সময়ের মধ্যে এ সামগ্রী কোথায় পাওয়া যাইবে ? যুবন সিংহ সহাস্যে কহিলেন, ''চিলকে ঘরমে মাসকা ঢের ।'' - ২২।

দ্বিতীয় ভাষা (হিন্দী) ব্যবহারে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষাকৌশল তুলনারহিত । পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হয় বাংলাও না, হিন্দীও না - নতুন কোন ভাষায় লেখা উপন্যাস পড়ছি । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সার্থক শব্দ চয়নে উপন্যাসের বাস্তবনিষ্ঠতা বেড়েছে - বক্তব্য অধিকতর সরসতা লাভ করেছে ; চরিত্র, চিত্রের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । কোন কোন স্থলে এই সার্থকতা এমন চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে যে তখন সন্দেহ জাগে - ঐ কথাটি বোঝাতে কোন বাংলা প্রতিশব্দ হয়তো অতটা সঠিক হত না । দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক -

> তাহারা তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যূহের বাহির করিয়া দিল ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগল - '' বাঙ্গালীকা সবই আজব হায় ।'' - ২৩।

লেখক ''বাঙ্গালীকা সবই আজব হায় ।'' না লিখে ঐ বক্তব্য বাংলায় লিখতে পারতেন । কিন্তু ঐ একটি হিন্দী বাক্য ব্যবহারে বাঙ্গালীদের সম্পর্কে বিহারী দর্শকচরিত্রদের (হয়তো সব বিহারীর) মনোভাব ও ধারণা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে । প্রসঙ্গত: বলা ভাল বাঙালীদের প্রতি বিহারীদের বক্র মনোভাবের প্রকাশ পরেও দেখা যাবে । পূর্ব অধ্যায়ে এ বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়েছে ।

বাঙালীর আজব ব্যবহারে লেখক নিজেও বোধ হয় সম্মিত হয়ে উঠেছেন। অথচ অনেকগুলো বাংলা বাক্যে এ কাজ হত না। আর এক জায়গায় একটি - মাত্র হিন্দী শব্দের ব্যবহারে বাঙালীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব লেখক প্রকাশ করেছেন - ''বাবুদের কেহ বলিলেন - 'idiot' (বিকৃতমস্তিষ্ক), কেহ বলিলেন ''বিচ্ছু বাঙালী''। - ২৪।

সঠিকস্থানে হিন্দী শব্দের ব্যবহারিক উপযোগিতাকে এইভাবে কাজে লাগিয়ে বিহার প্রবাসী উপন্যাসিকগণ বাঙলা উপন্যাসের পরিমণ্ডলকে বৃহত্তর করেছেন। শীতের গভীর রাত্রে '' যণ্ডিজক্সেন্'' স্টেশনে দেওঘরের গাড়ীতে বসে লেখক কেদারনাথ যে সরস অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ''কোষ্ঠীর ফলা - ফল'' উপন্যাসে তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি পাণ্ডা ও কুলীদের চরিত্র চিত্রণ করেছেন।'' মণ্ডামণ্ডা'' পাণ্ডাদের কবলিত হওয়ার ভীতি ও ভাবনা এবং পাশাপাশি ''নন্দকিশোর'' কুলির চিত্র চরিত্রানুযায়ী ভাষার কারুকার্যেই পূর্ণতা পেয়েছে। হিন্দী ও বাংলা বাক্যের সংমিশ্রণে হিন্দী বাক্যরীতিতে গড়ে উঠেছে এক মজাদার ভাষা। -

> মধ্যে মধ্যে এক - একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল মূর্তি, সহসা গাড়ীর মধ্যে মুখ বাড়াইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, - ''তোমার নামটি কি আছে ? - তোমার পিতার নামটি কি আছে ? - তোমার পাণ্ডার নামটি কি আছে ? - সকলেরই ঐ তিন প্রশ্ন। - ২৫।

অন্যদিকে নন্দকিশোর কুলী ভরসা দিয়েছে -

> সুতরাং একে ভরসা - নন্দকিশোর। সে বলিয়াছে - ''কুছ্ চিন্তা নেই বাবুজি, ইচ্ছা করেন গরীবের ঘর আছে - সে আপনাদেরই ; না হয় টীসেন্সের সাত গজকে মধ্যে সুন্দর দো - মহলা ধরমশালা আছে ; সেখানে বিশ্রাম করবেন। আপনার যা পছন্দ হয়। প্রাতঃকাল হতেই হাযির হাজির হোবে, - ঠিকানা ঢুঁড় দেবে। কুছ্ চিন্তা কোরবেন না বাবুজি। - ২৬।

উপরোক্ত- 'মোশার নামটি কি আছে ? .....' বাক্যগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাক্যগঠনরীতি হিন্দী ভাষার ।

এই রীতিই আর একটু পরিবর্তন করে অন্যত্র ভাষাকে অভিনবরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে -

> আগন্তুক আরম্ভ করিলেন -
> ধেমোশালিক বনমেকে ওয়াস্তে সর্বপ্রথম, - যা কো জলদি গঙ্গা পাওয়ানো চাই । বাপকো ভি পাওয়াতে পারলে বহুত আচ্ছা - অসমর্থ পক্ষে কাশীযাত্রা করাবে । তারপর ভারি ভারি চিজ - টেবিল, চেয়ার, খাট, সিন্দুক, আলমারি, বাসন, বগায়রা নিলাম, আউর পরু, বাছুর - দানশূন্য করনে হোগা । গরীব আশ্রিত আত্মীয় কোই রহেতো - রাস্তাকে হাঁকা দেবে । কুত্তা থাকেতো মিউনিসিপ্যালিটির লাঠির মুখে দেবে, আর বিল্লিকে আছাড় মারকে সাবাড় কোরবে । তদনন্তর স্ত্রী আর পুত্র - কন্যা লেকে রাস্তামে দাঁড়াবে । অতঃপর কোমর বাঁধকে প্যাঁকাটি জ্বালকে হরিবোল দেকে - ঘরবাড়ীর মুখাগ্নি করকে - ফুঁক দেনা চাই । এবম্ - প্রকার যে ভিটে ভস্ম হয়ে গেলে, তিন দফে বোলনা চাই -
>
> বাংলার মাটি বাংলার জল -
> শূন্য হোক্ - শূন্য হোক্
> হে ভগবান্ !
>
> পরে এক দৌড়ে রেজেস্ট্রী আপিসমে যাকে, গেঁটের কড়ি দেকে, - জমি, জল আর পোড়া ভিটেকা নতুন নামকরণ কোরবে - ''ঘুঘুডাঙ্গা''। ..... তদনন্তর বড়ি মজিমে নোকরি করো, চাকরি বাজাও, বকরি চরাও টোকরি বেচো, সব রাস্তা সাফ্ ।
> - ''বাবুজি ইসিকা নাম ''ধেমোশালিক'' হো যানা
> - জিসকো আপ্ উচ্চ শিক্ষিত লোক্ রাজভাষামে -
> '' ডোমিসাইল্ড (Domiciled) কহতে হেঁ ।'' - ২৭।

বাংলা ভাষায় ঠিক এভাবে বলা হয় না - বাক্যগঠনরীতি হিন্দী ভাষার - তা ছাড়া বাংলা তৎসম শব্দের পরেই হিন্দী ক্রিয়াপদযোগে বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে । যেমন - '' তদনন্তর স্ত্রী পুত্র - কন্যা লেকে'', '' অত:পর কোমর বাঁধকে ইত্যাদি । ভাষার অভিনবত্ব বক্তব্য বিষয়ের অভিনবত্বকে পরিপূরণ করেছে । ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মিশ্রণে উচ্চস্তরের হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে ।

দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করতে করতে বাঙালী ও বিহারী পরস্পর পরস্পরের ভাষা শিখে নিয়ে মিলেমিশেই থেকেছে - ভাষার ভিন্নতা ভাববিনিময়ে বাধা হতে পারেনি । নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি লক্ষণীয় -

> বিনোদ এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ের কাছে বসে পড়লো । - '' আমার শিউনাথকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তার সাহেব । আমার কেউ নেই, ঐ একটি মাত্র ছেলে ।'' যামিকলালই কথা কইলে - '' কোনো ডর নেই মায়ি, লেড়কা আরাম হো যায়গা - ডাক্তার সাহেব এসেছেন ।'' - ১৮।

'শিউনাথে'র মা হিন্দুস্থানী - কিন্তু বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে সে বাঙলায় কথা বলেছে (বোধ হয় ভেবেছে বাঙালী ডাক্তার বাংলায় বললে বক্তব্য ভাল বুঝবে)। আর বাঙালী যামিকলাল তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে হিন্দীভাষায় । এও দেখা যায় বাংলার বাইরে (এখানে - বিহারে) প্রবাসী বাঙালীরা যে দেশে বাস করেন আলাপ আলোচনায় বাংলা ভাষার সঙ্গে সেই দেশের ভাষার (এখানে হিন্দী) বাক্য বা বাক্যাংশ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে যান । আরও লক্ষণীয় যে সব কথায় জোর দেওয়া দরকার সেই কথাগুলো হিন্দীতে বলেন । এটা প্রায় সাধারণ ঘটনা । একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক -

> আমিই বিনোদকে বাছাই করে কাজে পাঠিয়েছি । ওর কাজ আমি জানি - প্রাণ দিয়ে কাজ করে - ফাঁকি দেয় না । ও যদি এই ইনজেকসন ছেড়ে উঠে আসতো, ওর চাকরি থাকত না - কালই অন্য ডাক্তার পাঠাতুম । হাম কিসিকা খাতির নেহি রাখতে । জান সবকা এক হায়, কেয়া গরীব,

> কেয়া রহিম । হামারা যাঁচ বড়া কড়া হায় ইত্যাদি বলে' - হো হো করে হাসলেন । - ২১।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের পালা (আলোচনার কাল - ঐ-যানুসারে) । তাঁর উপন্যাসে বাঙলার যাকে যাকে দু/ একটা হিন্দী শব্দ বা বাক্যের সার্থক ব্যবহারে নিখুঁত চরিত্র - চিত্রণের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায় । উদ্ধৃত অংশ -

> বলিতে বলিতে, যানীমুন্ত আসিয়া দাঁড়াইল । পায়ে দুইটি কাঁসার মল, গায়ে একটি গেঞ্জি, হাতে তীর ধনুক ।
> গদাই বলিল, '' এটি তোমার ছেলে নাকি ?
> - কিরে তোর নাম কি ?''
> সে বলিল - ''রামদাসোয়া ।''
> '' রামদাসোয়া ? বেশ/ বেশ / এই নে একটা পয়সা । মিঠাই খাবি ।''
> রামদাসোয়া পয়সাটি লইয়া তৎক্ষণাৎ সেটিকে বাঁহাতে মুঠা করিয়া ধরিল ।সে হাতটি পৃষ্ঠের পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বিতীয় বার প্রসারিত করিয়া বলিল, ''আউ ।'' যানী লজ্জিত হইয়া, '' তু তো বড়ী পাজি বুঝাওত হ রে'' - বলিয়া তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া যাইতে লাগিল । - ৩০ ।

উপরোক্ত পদ্যাংশে একটি হিন্দী শব্দ ''আউ'' এবং একটি হিন্দী বাক্য - '' তু তো বড়ী পাজি বুঝাওত হ রে'' ব্যবহার 'রামদাসোয়া'' চরিত্রটিকে সাব - লীল করেছে এবং যৌলিকত্ব দান করেছে ।

লেখক অনায়াসে বাংলাতেই পুরো বক্তব্য রাখতে পারতেন । বিহারে দীর্ঘ প্রবাস - জীবনে তিনি হিন্দী এবং ভোজপুরী উপভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন । তার ফলে অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সুষ্ঠু হিন্দী প্রয়োগে সার্থক চরিত্র সৃষ্টি করতে

পেরেছেন । প্রভাত কুমারের সম্পর্কে ড: নন্দদুলাল রায়ের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে - '' হিন্দী ভাষায় এবং ভোজপুরী উপভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল এবং তাঁহার রচনাতেই বাংলা গল্পে সর্বপ্রথম শুদ্ধ হিন্দী এবং ভোজপুরীর প্রবর্তন দেখিতে পাওয়া যায় ।'' - ৩১। খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনাও সরস হয়ে উঠেছে বাঙলা ভাষায় হিন্দীর ছুট সমন্বিত হওয়ায় । - নিম্নলিখিত উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক -

> খুব্রুর ষ্টেশনে রাখাল বৎসর খানেক আছে । ..... ষ্টেশনের পানিপাঁড়ে তাহাকে দুই বেলা দুইটি বাঁধিয়া দেয় - এজন্য তাহাকে বেতন বল, বখশিস্ বল, মাসে দুইটি করিয়া টাকা দিতে হয় । পাঁড়েজি ''রহড়কা দাল'' এবং ''আলুকা ডুল্কি'' ছাড়া আর কিছু রাঁধিতে জানেন না । - ৩২।

আর এক জায়গায় -

> এমন সময় টেলিগ্রাফের ঘণ্টা টং টং করিয়া বাজিয়া উঠিল । রাখাল গিয়া কল ধরিল ; এবং একটু পরেই হাঁকিল, '' মহাবীর সিং, এ মহাবীর সিং উঠো উঠো, ফতুয়া মালগাড়ী ছোড়া ।''
> মহাবীর সিং উঠিয়া বসিল । একটি হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া বলিল, ''সীতারাম, সীতারাম । কোন্ নম্বর বাবু ?''
> ''ছাব্বিশ নম্বর ।'' - ৩৩।

''নবীন সন্ন্যাসী'' উপন্যাসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর চরিত্র ও কার্য্যনীতি, সন্ন্যাসী ও তার চেলার কথোপকথনে প্রকাশ করেছেন । বলা বাহুল্য সন্ন্যাসী হিন্দীভাষী ।

> '' আরে - আওর দো ঘুরত সাধু আয়া । উসমে আওর দো ছটাক ভাঙ্গ ডাল্ দে ।''

> ''তেহেরি চেলা হ্যায় ?''
> '' দেখ, হামারা দো চেলা ; এক চেলা ভাঙ্গ পিযে, এক চেলা গাঁজা চটায় ?'' - ৩৪।

দেহাতি হিন্দীভাষায় লেখকের পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল । বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে হিন্দীভাষা ও বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য হিন্দী ভাষার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে । তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি বাংলা উপন্যাসে অক্ষয় করে রেখেছেন । নিম্নোক্ত উক্তি - প্রত্যুক্তি তার একটি দৃষ্টান্ত -

> পেয়ারা চর্ব্বন করিতে করিতে, বোঁ করিয়া একপাক ঘুরিয়া, রামদাসোয়া বলিল, ''হাম্ যায়ব ।''
> মালী বলিল, '' তুই, তোকে কোনে করিয়া লইয়া যাইবে কে ?''
> আর একটা ঘুরপাক দিয়া রামদাসোয়া বলিল, ''তোরা কান্ধাপর চড়কে যায়ব ।'' - ৩৫।

'' মনের মানুষ'' উপন্যাসে ও হিন্দী সংলাপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় -

> আজ চার বাজেকে পাসিঞ্জারমে । হাম ইস্ মকানকা মালিকের হাঁয় । কোই তিন সাড়ে তিন বাজে যব্ না আয়া, ঘরকা কিরিয়া যো বাকী থা সো দিয়া, এক মাহিনাকা কিরিয়া পেশগী দিয়া, আপনা চিজ-বস্ত লেকে চলা গিয়া ।'' - ৩৬।

প্রভাতকুমারের সংলাপ রচনায় হিন্দী ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে ড: শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায়, তাঁর ''প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য'' গ্রন্থে লিখেছেন -

> হিন্দী সংলাপের বৈচিত্র্য প্রভাতকুমারের সাহিত্যের একটি উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য । বাঙ্গালীর মুখে তিনি বাঙলামিশ্রিত হিন্দী যেমন ব্যবহার করিয়াছেন তেমনই শুদ্ধ হিন্দীও ব্যবহার করিয়াছেন । হিন্দীভাষীর মুখেও তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দী ব্যবহার করিয়াছেন ।

> পুলিশ কনেষ্টবল, দ্বারোয়ান শ্রেণীর মুখে তিনি ভোজপুরী অথবা মগহী ব্যবহার করিয়াছেন।
>
> হিন্দী ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি একজন মাড়োয়ারির মুখের হিন্দী এবং একজন মৈথিল পণ্ডিতের মুখের হিন্দী একরূপ নয়। - ৩৭।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''আরণ্যক'' উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে নাঢ়া বইহার, ফুলকিয়া বইহার, লবটুলিয়া বইহার, সুংঠিয়া বইহার, আজমাবাদের কথা। প্রকৃতি, ফুলফল, পশুপাখী, মানুষ সব একান্তভাবে ঐ সব অঞ্চলের। কিন্তু লেখক চরিত্রগুলোর মুখে সব সময় তাদের নিজস্ব ভাষা বলান নি। এ বিষয়ে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন - '' মঞ্চী সেই মেয়েটি যে আমাকে বুনো হাতীর গল্প বলিয়াছিল। সে আসিয়া শুষ্ক কাশের ডাঁটায় বোনা একখানা চেটাই পাতিয়া দিল। তার সেই দক্ষিণ-বিহারের 'ছিকাছিনি' বুলির সুন্দর টানের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল - কেমন দেখলেন বাবুজী বইহারের মেলা ? ...'' - ৩৮।

বিভূতিভূষণ এই 'ছিকাছিনি' ভাষা খুব পছন্দ করতেন কিন্তু বলতে পারতেন না। সম্ভবত: সেই কারণেই চরিত্রোপযোগী ভাষা তিনি সর্বত্র ব্যবহার করতে পারেন নি। ভানমতী, ফুলপ্রসাদ, নকছেদী ভকত, তুলসী, মটুকনাথ পাঁড়ে, রাজু পাঁড়ে- সকলেই বিভূতিভূষণের ভাষায়ই কথা বলেছে। তবুও অনেকস্থলেই ভাষার প্রভাব তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক - একদা সত্যচরণ ['আরণ্যক' সত্যচরণের জবানিতে বিবৃত হয়েছে] বনের মধ্যে চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলেন। কিছুদূর চলার পর তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের সন্ধানে অগ্রসর হন এবং এক জায়গায় ধোঁয়া উঠতে দেখে সেখানে উপস্থিত হন। একদল লোক সেখানে কাঠ পুড়িয়ে ''লকড়ি কয়লা'' তৈরী করছিল। সত্যচরণ জল চাইলে একজন ''যাজা ঝকঝকে জামবাটিতে'' পরিষ্কার পানীয় জল এনে দিল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল বনের মধ্যে ঝরণা আছে। সত্যচরণ সে ঝরণার কথা জানতেন না। তারা জানাল -

> ঝরণা নাই হুজুর, উনুই ! পাথরের গর্তে একটু একটু করে জল জমে, এক ঘণ্টায় আধ সের জল হয়, খুব সাফা পানি, ঠাণ্ডা ও বহুৎ। .....

> উহারা বলিল - এ ঝরণার কথা অনেকে জানে না হুজুর, আমরা জঙ্গলে হরবখত বেড়াই, আমরা জানি । - ৩৯ ।

প্রথম অধ্যায়েই যুনেশ্বর সিং এর ঝড়াই কেনার আনন্দ প্রকাশে লেখক তার মুখে তার ভাষাই ব্যবহার করেছেন । প্রসঙ্গসহ উক্তির উদ্ধৃতি -

> পরদিন আমার সইকরা চিরকুটের জোরে যুনেশ্বর সিং নউগাছিয়ার বাজার হইতে একখানা পাঁচনম্বরের ঝড়াই কিনিয়া আনিয়া আমার ঘরের মেজেতে নামাইয়া আমায় সেলাম দিয়া দাঁড়াইল ।
> - হো গৈল, হুজুর কী কৃপাসে - ঝড়াইয়া হো গৈল ! - ৪০ ।

বনে আগুন লেগেছে - দাবানল - '' সিপাহীরা শুষ্কমুখে ভীতকণ্ঠে বলিল - আগ তো আ গৈল, হুজুর ! বলিলাম - সব জিনিস বার কর । সরকারী তহবিল ও কাগজপত্র আগে ।'' - ৪১ । আর এক জায়গায় কর্মচারীদের সংলাপ চলছে তাদের কথ্য ভাষায় । যেমন -

> রামবিরিঞ্চি সিং চাকলাদার অবাক হইয়া বলিল - পানি কাঁহা নেই ছে ..... আরে এ লাল হাঁসকা জেরা কাঁহাসে আয়া, ভাই রামলখন ! গোষ্ঠ মুহুরী বিরক্ত হইয়া বলিল - আঃ বাপু রাখ । এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, লাল হাঁস কোথা থেকে এল তার কৈফিয়ৎ কি দরকার ? - ৪২ ।

এমনি করে বাংলা কথার মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দ বা বাক্য ব্যবহার বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করেছে, পরিবেশকে অন্তরঙ্গ করেছে । এক জায়গায় বিভূতিভূষণ ঠেঁট হিন্দী বুলির প্রতিমধুরতার কথা বলেছেন -

> একটু পরে কবিপত্নী বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং একটা থালা হাতে আবার আসিয়া খাটিয়ার প্রান্তে থালাটি রাখিলেন ; এবার আমার সামনেই চাপা কৌতুকমিশ্রিত সুরে আমাকে শুনাইয়া বলিলেন - বাবুজীকে

> বল এইবার ঘরের তৈরী প্যাঁড়া খেয়ে গালের ভুলুনি থামান ।
> কি সুন্দর মিষ্টি মেয়েলি ঠেঁট হিন্দী বুলি !
> বড় ভাল লাগে এ অঞ্চলের মেয়েদের মুখে এই হিন্দী ঠেঁট টানটি ।
> নিজে ভাল হিন্দী বলিতে পারিনা বলিয়া আমার কথ্য হিন্দীর
> প্রতি বেজায় আকর্ষণ । বইয়ের হিন্দী নয় - এই সব পল্লীগ্রামে পাহাড়-
> তলীতে, বনদেশের মধ্যে বিস্তীর্ণ শ্যামল যব গম ক্ষেতের পাশে, চলন-
> শীল চামড়ার রহট্ যেখানে মহিষের দ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া ক্ষেতে জল সেচন
> করিতেছে, অস্তসূর্যের ছায়াভরা অপরাহ্নে দূরের নীলাভ শৈলশ্রেণীর দিকে
> উড়ন্ত বালিহাঁস বা সিল্লী বা বকের দল যেখানে একটা দূরবিসর্পী
> ভূপৃষ্ঠের আভাস বহন করিয়া আনে - সেখানকার সে হঠাৎ - শেষ-হইয়া
> - যাওয়া, কেমন যেন আধ আধ ভাঙা - ভাঙা ত্রি-য়াপদ যুক্ত - এক
> ভাষা, যাহা বিশেষ করিয়া মেয়েদের মুখে শোনা যায় - তাহার
> প্রতি আমার টান খুব বেশী । - ৪৩।

কিন্তু ঔপন্যাসিক যখন এই স্থানীয় কথ্য হিন্দীর সঙ্গে নিজে বিশেষ পরিচিত - লেখায় এবং বলায়, সেখানে তিনি চরিত্র এবং ভাষাকে মিলিয়েই উপস্থাপিত করেছেন - পাঠকের কথা চিন্তা করে বন্ধনীবদ্ধ বাঙলা - ভাষ্য সংযোজন করেছেন । বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এই রকম একজন বাঙালী ঔপ - ন্যাসিক । তাঁর রচিত '' স্বর্গাদপি গরীয়সী'' (১ম, ২য়, ৩য়) এবং ''অযাচী সন্ধানে'' উপরোক্ত শ্রেণীর উপন্যাসগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই উপন্যাসগুলোতে আমরা কথ্য হিন্দীর টান খানিকটা উপলব্ধি করতে পারি । বিভূতিভূষণ স্বর্গাদপি গরীয়সী (২য়) উপন্যাসে কথোপকথনে মৈথিল ভাষাকে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন - যার ফলে বিহারী ও বাঙালীর ভাব বিনিময় বাধাহীনভাবে ঘটেছে এবং উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতি স্বাভাবিক ও বাস্তব হয়েছে । ভাষার রূপ এবং নির্মিতি - দুয়েরই মান বর্ধিত হয়েছে । দুলারমন ও যতিবালার সঙ্গে কোন পার্থক্য করা যায় না -

স্বর্গাদপি গরীয়সী (২য়) উপন্যাসে দুলারমন এমন একটি চরিত্র যে "একটু সুবিধা পাইলেই বাংলার গল্প শোনে, যার কাছেই সুবিধা হয় ।" - ৪৪।

সে বিহারের পাণ্ডুলের স্থানীয় অধিবাসী । বাংলা ভাষা এবং বাংলা দেশের গল্পের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ । ' সে বাংলা ভাষা বোঝে' - এ কথা ব্যঙ্গ করে গর্ব অনুভব করে । '' মোতিবালা যদি এক একবার মৈথিলীতে বুঝাইয়া দিতে যানতো দুলারমন ফোঁস করিয়া ওঠে - ''হে, খবু হে মোতি, দুলারও কিছু কিছু বাংলা বুঝেইছেই ; ই: উয়্যা একটা কাবিল ডেলি হ্যা ।'' (খামো গো মোতি দুলারিয়াও কিছু কিছু বাংলা বোঝে ; ইস্ উনিই এক বিজ্ঞ হয়েছেন ।)'' - ৪৫। এই মধুর অভিজ্ঞতা আমরা কোথায় পেতাম যদি না বাঙালী প্রবাসী হতেন এবং প্রবাসী বাঙালী লেখক হতেন ? 'স্বর্গাদপি গরীয়সী (২য়)' উপন্যাসটি মিথিলাপুরীর অধিবাসিনীদের রহস্যালাপের মাধুর্য্যে রমনীয় হয়ে উঠেছে - সেই সঙ্গে প্রবাসী বঙ্গ-বধূদের রহস্য প্রিয়তার সংযোগ ঘটে ভিন্ন রসের সৃষ্টি হয়েছে । ভাষার পার্থক্য আলাপে বাধা হয়ে ওঠে নি । দু/একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক । গিরিবালার বৌভাতের পরদিন দুপুরে কয়েকজন সম বয়সী মেয়ে মিলে আড্ডা বসেছে । পাড়ার জানকী, লছমী, দুলারমন, কৌশল্যা, রামপিয়ারী প্রভৃতি পাড়ার কিশোরি মেয়েরা মিলে নববধূর সঙ্গে ঠাট্টা তামাসার মধ্য দিয়ে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করছে । ঠাট্টার বিষয় দেশ, দেশের লোক, কয়েকটা বাংলা কথা শিখেছে - এইসব । ঔপন্যাসিকের ভাষায় -

> গিরিবালা প্রথম দিন ক্লান্তিবশত: বলিয়াছিল - ''ঘুমব'', ওদের ভাষায় কথাটার মানে হয় ''বেড়াব''। সেই লইয়া বিদ্রূপ হইতেছে - ''ম্যায়ু গে, কনিয়া অবেৎমাত্র কইছতিন ঘুমব । (মাগো, কনেবৌ আসা মাত্রই বলেন বেড়াতে যাবে !)'' - ৪৬।
>
> খাওয়া দাওয়ারও কথা উঠিল । - ..... গিরিবালা বলিলেন - ঠাকুর - ঝি, বলনা এরা খাবার আর জানেন কি ! এই তো দেখলাম - গাবদা

> গাবদা আটার লুচি, দু'টো তরকারি হ'ল কিনা হ'ল তারপরেই জিলিপি, ব্যস সন্তুষ্ট । আমাদের ওখানে অন্তত: তিন চার রকমের - তরকারি - শাকভাজা, বেগুনভাজা, ছক্কা, ডালনা, ডাল, মাছ, অম্বল ..... ।
>
> উত্তর দিবার জন্য সবাই হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল - একজন টানিয়া টানিয়া বলিয়া উঠিল - '' আর ডাঁটাকে চচ্চাড়ি নেই কহলি ?'' সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ।
>
> - ৪৭।

বাংলা দেশের মৌরলা মাছের ঝোল, পদ্মপাতায় বা কলা পাতায় ঘি - ভাত খাবার খ্যাতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে । এখন দেখা যাচ্ছে ডাঁটা চচ্চাড়ির কথাও সুদূর মিথিলা পর্যন্ত প্রচারিত । এই উপন্যাস পড়ে রন্ধন - পটীয়সী কোন অখ্যাত বঙ্গললনার মন একবার অন্তত: জানকীর দেশের ঐ দুরুরের আড়ডায় সামিল হবে । এখানেই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব । বাঙালী যেখানে গেছে সেখানেই সে তাঁর সংস্কৃতির অংশীদার বাড়িয়েছে । ' স্বর্গাদপি গরীয়সী' , 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি', 'অযাচী সন্ধানে' - এই তিনটি ঔপন্যাস বাঙলা - মৈথিল-মিশ্রভাষাকে বহন করে অক্ষয় হয়ে থাকবে । দ্বিতীয় ভাষা উপন্যাসকে শিল্প সুষমায় মণ্ডিত করেছে, লেখকের মৈথিল ভাষায় জ্ঞান ও প্রয়োগের পারঙ্গমতা উপন্যাসের বাস্তবতা বৃদ্ধি করেছে ; উক্ত উপন্যাসগুলোকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দান করেছে । এখনকার বিহার - বাসী কোন বাঙালীই এ ধরনের উপন্যাস লিখতে পারবে না কারণ সেই প্রতিবেশ পরিবর্তিত হয়ে গেছে ।

'অযাচী সন্ধানে' উপন্যাসে এক পণ্ডিত মৈথিল ব্রাহ্মণের কথা বর্ণিত হয়েছে । লেখক মধুবনীতে গেছেন সেই পণ্ডিতজীর সাক্ষাতে । কিন্তু পণ্ডিতজী গত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছে । বিভূতিভূষণের নিজের ভাষায় -

> আমি বললাম - '' বহুত দিনপর দর্শন ভেটল । মন হৈইয়া চরণ স্পর্শ কয় কৃতার্থ হইয়া হুঁ ।'' (অনেক দিনের পর দেখা, মনে হচ্ছে একবার পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে কৃতার্থ হই ।) এরপর যা হল, তাতে বোধ হয়

> প্রণাম গ্রহণ করবার ওঁর অভ্যাস আছে বলেই মনে হোল । অস্পষ্ট [.....] আরও খানিকা ভেঙে [.....] উনি পাশেই দাসীর দিকে চেয়ে, যেন না বোঝার ভান করেই একটু নিম্নস্বরে প্রশ্ন করলেন, ''কী কহইছৎ ?'' (কি বলতে চাইলি ?) দাসী বলে দিলে, একটু কুণ্ঠা কাটিয়ে পা দুটো অল্প বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বললেন - ''অবেৎ . হয়র উমেরক অপেক্ষা নন্যে থিকাহ । পরন্তু এর কি প্রয়োজন ছলৈক ।'' (আসুন । আমার বয়সের তুলনায় তো ছেলে - মানুষটি, কিন্তু এর প্রয়োজনটা কি ছিল ?) '' প্রয়োজন হয় বুঝেছি মাতাজী ।'' বলে আমি একটু এগিয়ে গিয়ে চৌকাটের এদিক থেকেই পায়ের ধুলো নিয়ে এসে বসলাম ।''
>
> - ৪৮।

লেখক নিজেও মৈথিল ভাষা বলতে ভালবাসেন - সাহারসা থেকে ফেরবার পথে একটি ছোট্ট নদীর দেখা পেয়ে বলে উঠলেন - ''ঠিক এই সময় এই নদীটির দেখা। তাই বলছিলাম মাঠাহির দুলারী আমার নীল নদ দেখবার সাধ কতকটা করেছে পূরণ ।''

- ৪৯ ।

ভাষার যাদুস্পর্শে বক্তব্য অধিকতর ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে যখন দ্বিতীয় - ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে বক্তব্যের অনুষঙ্গী সেই ভাষার কোন প্রবচন বা কিংবদন্তী বা গীত যুক্ত হয় । অযাচী মিশ্রের চরিত্রের অনেকখানিই প্রকাশিত হয়েছে নিম্ন - লিখিত তিন পঙক্তির একটি কিংবদন্তীতে —

> '' কোন একটা ঘটনার যেন একেবারে শেষের দিকের ব্যাপার । তিনটে লাইন আমার মনেও গেঁথে আছে —
>
> এতে কহি লখিয়ৎ ছোড়ে সভা অযাচী
> কোহু কহে বাহ বাহ কোহু কহে ছি ছি
> বুঝি গেল রাজা বুঝি গেল মন্ত্রী
>
> মানেটা আপনি বুঝবেনই - অর্থাৎ এই কথা বলে অযাচী সভায় লাথি মেরে বেরিয়ে গেলেন । কেউ বা: বা: বলল, কেউ বলল ছি ছি ।''— ৫০।

এই প্রবচন, গীত, ছড়া দেশীয় ভাষার হলে ঐ দেশের ভিন্ন পরিবেশকে বুঝতে আমাদের সুবিধা হয়। বিহারপ্রবাসী বাঙালী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে ছড়া প্রবচনের প্রাচুর্য্য। এই অধ্যায়েরই শেষের অংশে উদাহরণ সহ এর আলোচনা করা হবে।

বাক্য ছাড়া একটি বা দুটি হিন্দী অথবা মৈথিল শব্দ বাক্যে ব্যবহার করেছেন এমন দৃষ্টান্তও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় প্রায় প্রতি পাতায়।

> রোদের তাত বাড়ায় ছায়া খুঁজতে আরম্ভ করেছে লোকে, কোথাও গাছের তলায় জটলা, কোথাও কারুর 'দুরুখির দাওয়ায়- দুরুখিটা হচ্ছে সদরঘর ; ঠিক ঘর নয়, চওড়া বারান্দা, দোর জানলা নেই। ..... খৈনি মাড়া হচ্ছে বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের বুড়ো আঙুলে ড'লে টেপার তালে মাথা দুলছে ; একটু চুন কম হয়েছে, একজন নিজের 'চুনৌটি' থেকে একটু বের করে এগিয়ে দিলে। .... জোর গল্প জমেছে- ''পরন্তু রমাকান্তক কুটুম্ব নৈ নিক ভেলেন'' - পরন্তু রমাকান্তের কুটুম্ব সুবিধের হয়নি। - ৫০(ক)।

ওপরে 'দুরুখি', 'চুনৌটি' শব্দগুলো লক্ষণীয়। এমন শব্দ আরও অনেক ব্যবহৃত হয়েছে- যথা- আকিল (আক্কেল), মেহরারুর, ভোঁট -মোলাকাণ্ডটা, সলাহ (পরামর্শ), সাজোয়ান (জোয়ান), বখরা, খুবরি, জানটা, ধীরজ, খদয়, তল্লাশেতে, ইঁজোরিয়া, ঘুঁতি, খড়োর, পেখে, পরসাদি, ভগবানজী, বড়ম আপ ইত্যাদি।

বনফুলের রচিত অনেক উপন্যাসেই তিনি কথোপকথনে হিন্দী ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'মৃগয়া' উপন্যাসের জগদেও পাঁড়ে হিন্দী বাংলা মিশিয়ে কথা বলে। যেমন-

> জগদেও প্রথমে হিন্দিতেই বলিল, ডাক্তারবাবু ফটকটিয়াসে সওয়ার হো কর বাতাসপুর গয়ে হেঁ রোগী দেখনেকে লিয়ে ; তাহার পর কি মনে করিয়া বাংলাতে বক্তব্যটা শেষ করিল - সেইখানে সে হামাদের সং লিবেন। - ৫১।

অশুদ্ধ বাংলা - অবাঙালীরা যেমন বলে থাকেন । আর এক জায়গায় জগদেও হরিণ খুড়োকে গল্প বলার অনুরোধ করছে । লেখক সে কথা অনায়াসে বাংলায় লিখতে পারতেন । কিন্তু লিখলেন - ''..... ছোড়েন একঠো গপ্‌সপ্ । ... বাঘ, ভাল্, রাছস্, ...।'' - ৫২।

কোন কোন উপন্যাসে হিন্দী ও বাংলা বাক্যের মিশ্রণ প্রায় সমান বা হিন্দী বাক্যই বেশী গ্রহণ করা হয়েছে - যেমন 'হাটেবাজারে', 'অধিকলাল', 'ভুবন সোম' ইত্যাদি উপন্যাসে । হাটেবাজারে উপন্যাসের চরিত্রগুলো অধিকাংশ দেহাতী বিহারী । এদের বাক্যালাপে কথ্য হিন্দী ব্যবহার করায় চরিত্রগুলো বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে । হাটেবাজারে সম্পর্কে শ্রী সন্তোষকুমার মজুমদার লিখেছেন - ''এই উপন্যাস এক বিস্তৃত পটভূমিকায় অগণিত নরনারীর যাত্রাপথ ।'' - ৫৩। সেই অগণিত নরনারীর প্রত্যেকে তার নিজস্ব ভাষা নিয়েই মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর স্বাভাবিক সুভাবে । বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য হিন্দী ভাষার নিদর্শনমূলক সংলাপকে আত্মস্থ করে বাংলা উপন্যাস সার্থকভাবেই সমৃদ্ধ হয়েছে । ডা: সদাশিব ভট্টাচার্য বিহারের প্রবাসী বাঙালী । তিনি তো বাংলা ভালই জানেন, হিন্দীও । হিন্দী ভাষী অশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হিন্দীতেই হয় । ড্রাইভার আলীর সঙ্গে কথা হচ্ছে -

> ডা: সদাশিব ভট্টাচার্য মাছের বাজারের সামনে তাঁর মোটরটি থামালেন । তারপর ড্রাইভার আলীর দিকে চেয়ে বললেন - '' গাড়ি বাঁয়ে দাবাকে রাখ্‌খো । আর টিফিন কেরিয়ার ঠো লেকে হামারী সাথ আও ।'' '' বহুত খু - '' - ৫৪।

আর এক জায়গায় -

> চাকা ফিট করে আলী বললে - ''আইয়ে হুজুর, গাড়ি তৈয়ার হ্যায় ।'' গাড়িতে বসে' আলীকে জিগ্যেস করলাম - '' আলী তুম্ কুছ বাত বোলা

হ্যায় - ''

'' কভি নেহি হুজুর - ''

'' কভি নেহি বোলো - ''

'' বহুত খুব' -

'' দারু পিতে হো ?''

'' কভি নেহি হুজুর''

'' কভি নেহি পিও ।''

'' বহুত খুব - ''

হঠাৎ এই মিথ্যেবাদী ম্যাডান্টাকে ভাল লেগে গেল ।

- ৫৫।

হাটুরেরা সব বিহারী - তবে তাদের দেশে বাঙালী বাসিন্দা প্রচুর থাকায় তারা বাঙলা কিছু কিছু বলতে পারে এবং মোটামুটি বুঝতেও পারে । সদাশিব হাটে গেছেন -

..... সদাশিবকে দেখে ভক্তি-ভরে প্রণাম করলে বিলাতী সাহ ।

'' কেমনআছ বিলাতী ?''

'' হুজুরকা কিরপা চলে' যাচ্ছে ।''

- ৫৬।

এগিয়ে চলেছেন সদাশিব -

যে বুড়ি কুমড়ো বিক্রি করছিল সে যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেল । বেশ বড় দেখে ভালো একটা কুমড়ো বেছে দিয়ে বললে - ''এইঠো লে যা বেটা -

'' দাম কত ?''

বুড়ী দেহাতি হিন্দী ভাষায় বললে - '' তোর যা খুশী তাইদে'' -

সদাশিব তাকে দুটো টাকা দিলেন ।

'' ওতনা দাম নেই হোতে, আট আনা দে - ''

- ৫৭।

ওপরের উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে বনফুল বর্ণনায় বাঙলা ভাষা এবং বর্ণনার মাঝে সংলাপে ছোট ছোট হিন্দীবাক্য ব্যবহার করেছেন । তার ফলে বক্তার পরিচয়

সবিশেষ জানা যাচ্ছে । লক্ষ্ণৌয় এই দেহাতি হিন্দী ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট সংযত । বাঙালী পাঠকের হিন্দী - বোধগম্যতার কথাও নিশ্চয় তিনি ভেবে - ছেন । উপরোক্ত- ' বুড়ী'র কথা পাঠক যেটুকু বুঝবে সেটুকুই তিনি রেখেছেন - '' ওতনা দাম নেই হোতে, আট আনা দে - '' । যেখানে না বোঝার সম্ভাবনা সেখানে লিখেছেন ''বুড়ী দেহাতি হিন্দী ভাষায় বললে - ''তোর যা খুশী তাই দে - ''।

বহতা নদীর সঙ্গে ভাষার তুলনা করা হয়ে থাকে । ভাবও বহমান । প্রবাসবাসের অভিজ্ঞতার নানা উপাদানের মধ্যে ভাষার স্থান বোধ হয় সর্বপ্রথম । ভাবের সঙ্গে ভাষার বহমানতাকে কাজে লাগিয়ে, সীমাবদ্ধতাসত্ত্বেও, বিহারবাসী বাঙালী ঔপন্যাসিকগণ উপন্যাস সাহিত্যে দ্বিতীয়ভাষা প্রয়োগ বিষয়ে শিল্প সম্মত উৎকর্ষের প্রমাণ রেখেছেন । নিম্নলিখিত সংলাপটি অনুধাবনযোগ্য -

> '' রাম রাম ডাক্টার সাহেব, বনু কেমন আসে ?''
> সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, সৌখী মাড়োয়ারী এসে তাঁর আপিসের চাবি খুলছেন ।
> '' বনু মারা গেছে ।''
> '' মরিয়ে গেলো ? সরবোনাস্ হ'ল তাহ'লে । ও মুরদাকে এখন ফেকবে কে - ''
> বিদ্যুৎচমকের মত একটা কথা মনে হল সদাশিবের ।
> বললেন, '' সে ব্যবস্থা আমি করছি - ''
> '' আপনে কোরবেন ? কম সে কম দশ পন্দরহ্ টাকা খরচা হইয়ে যাবে - ''
> '' দেখি - ''
> - ৫৮।

এক টুকরো কথোপকথন একটা সামগ্রিক পরিচয় বহন করছে । ভাষা কত শক্তি-ময়ী! আর একটি উদ্ধৃতি -

> সদাশিবকে দেখেই শান্ত হয়ে গেল কমল ।
> সদাশিব জিগ্যেস করলেন - '' প্যাচকস্ হারালে নাকি -

|''কেউ টপিয়ে দিয়েছে । আসল পাকা স্টীলের জিনিস - '' - ৫১।

এখানে লেখকের মন্তব্যই অনুসরণীয় ।

|কমলরা বিহারে চার পুরুষ ধরে আছে । বিহারেই তার জন্ম ।
|সুতরাং ভাষার মধ্যে হিন্দী কথা ঢুকে গেছে । তাই 'হারিয়েছে'
|না বলে' টপিয়ে দিয়েছে বলল ।'' - ৬০।

বহুকাল বিহারে আছেন এমন বাঙালী পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাঙলা বলতে পারে না, বাঙলা জানে না বা হিন্দী - মেশানো ভাঙা বাংলা বলে । সেরকম দৃষ্টান্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের'আরণ্যক'উপন্যাসে এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ' কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি' উপন্যাসে পাওয়া যায় । ' অধিকলাল' উপন্যাসে বনফুলের ভাষার প্রয়োগ কৌশল আমাদের মুগ্ধ করে । হিন্দী কথ্য ভাষাকে বাঙলা উপন্যাস রচনায় এমনভাবে কাজে লাগানোতে তাঁর মুন্সিয়ানা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক তেমনিই পটভূমির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।অধিকলালের মা বিহারের এক অন্ত্যজ - শ্রেণীর (দোসাদ) অশিক্ষিতা রমনী । তার কথাবার্তা ও আচরণে তার কঠোর জীবনসংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় আর জানা যায় ঐ শ্রেণীর জীবনযাত্রা প্রণালী । ভাষার তীক্ষ্ণতা এ বিষয়ে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে । যেমন -

|'' খুদর্ -''
|দ্বারপ্রান্তে সমুন্দরি আসিয়া দাঁড়াইল । রবীন্দ্রনাথের কাব্য লোক হইতে
|চ্যুত হইয়া অধিকলাল হতভম্ব হইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত ।
|'' খুদর্বা - ''
|কি বলছ ?
|'' তোমার ব্যাপার কি ? তুমি দিনরাত এখানে পড়ে আছ কেন ?''
|''এখানে আমি নোকরি করি ।''
|'' নোকরি কর ? তলব কত ?''

'' তলব টাকায় পাইনা । কিন্তু এমন একটা ভালো ঘর পেয়েছি পড়া - শোনা করবার জন্য । যাইহি খেতেও দেন । এটাই কি কম ?''

'' এতে আমাদের কি 'নাফা' । রামদাসের বেটা ভুটা বোঝে তাহাতে ঘাটে কুলিগিরি করে মায়ের হাতে নগদ পয়সা এনে দেয় কোনদিন এক টাকা কোনদিন দেড়টাকা ।''

'' আমি সে সব পারব না । রামগোবিন্দের পায়ে তেল দিয়ে কুলিগিরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ।''

'' তুমি কি করবে তাহলে - ?''

'' আমি পড়ব ।''

'' পড়বে ? পড়ে তোমার কি পুছড়ি (ল্যাজ) বেরুবে, না দশটা হাত গজাবে ? - ৬১।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ছিকাছিনি ভাষা মঞ্জীর মুখে শুনে মুগ্ধ হতেন বন্ধুল কিন্তু সেই ছিকাছিনি ভাষার মাধুর্য্য সম্পর্কে প্রশংসা করতে পারেন নি । নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি অনুধাবন করা যেতে পারে -

ডাক্তারবাবুর কথায় খুদরু তাহার পর দিনই সকালে তাহার মায়ের সহিত দেখা করিতে গেল । গিয়া দেখিল তাহার মা ছাতু পিষিতেছে । তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার মা যে ভাষায় তাহাকে সম্বোধন করিল সে ভাষায় সে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত । এই তীক্ষ্ণ ছেকাছিনি ভাষা গালাগালিতে শ্লেষে ব্যঙ্গে অতিশয় সমৃদ্ধ । সমুন্দরি অধিকলালের দিকে একনজর চাহিয়া দেখিল তাহার পর শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল - '' কিরে বড়া আদমীর কুত্তা । এখানে এসেছিস কেন । 'লাত' (লাথি) মেরে তাড়িয়ে দিলে না কি - ।'' - ৬২।

আর একটি দৃষ্টান্ত । -

রামগোবিন হাতজোড় করিয়া চোখ বুজিয়া শুনিল সব । তাহার পর বলিল - ''আপনি হুজুর মহাত্মা লোক, বড়া আদমি । আমরা সব 'মুরুখ্' (মূর্খ) -

তবু একটো বাত আপনাকে বলছি । দুবরি (দুর্বা) কখনও পিপর (বট) হবে না । খুদরু হচ্ছে দুবরির জাত । তাকে পিপর করবার চেষ্টা করলে শুধু সময় নষ্ট হবে । দুবরি দুবরিই থাকবে কভি (কখনও) পিপর হোবে না । আপনি ওকে ছোড়িয়ে (ছেড়ে) দিন ।'' - ৬৩।

'' ভুবন সোম'' উপন্যাসে 'ভুট্টা'র ভাষাও কথ্য হিন্দী - কিন্তু সে ভাষা 'আঁধেরালা' গ্রন্থের ভাষা থেকে ভিন্নতর । ভুবন সোম সাহেবগঞ্জ থেকে ভাইপোর বাড়ী গেলেন - সেখান থেকে 'মহিষ - বাহিত শকটে' চড়ে গঙ্গার চরে রওনা দিলেন ভোর তিনটের সময় । উদ্দেশ্য পাখি শিকার । কিন্তু গাড়ির চালক ভুট্টা, মোষদুটোকে এমন তাড়া দিল যে তারা বেগে দৌড়তে লাগল । ভুবন সোম বুঝলেন এভাবে চললে শরীরের হাড় একটাও আস্ত থাকবে না । তাই সে ভুট্টার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলো -

'তোমার নাম কি বাবা ?'

'ভুট্টা'

'একটু আস্তে চালাও'

'জী হুজুর'

.....

'তুমি চাপটালি খেয়ে ব'স । পা ঝুলিও না ।'

' কি হুজুর ? কি করেলে কহিছ ?

.....

তিনি হিন্দিতেই অবশেষে বললেন, 'ভুট্টু , পয়ের ঝুলায়কে নেই বৈঠো ।

'তব হাঁকবে কৈসে বাবু ?'

'মহিষ কো কাতুকুতু নেই দেও ।'

'কুতু ? কুতু কোন চিজ হে ?'

> কাতুকুতুর হিন্দিও ভুবন সোমের জানা নেই । হয়া মুশকিল !
> 'এতনা জোরসে নেই হাঁকাও ।'
> ' বহুৎ দূর যাইলে পড়তে যে । বাবু কহি দেলকে আঁধার রহতে রহতে পৌঁছা দে ।'
> ' না বাবা, তুমি আস্তে চল ।'
> 'অব কিরিণ উগি যাইতে, চিচিড়িয়া নেহি মিলতে ।'
> ভাবার্থ বুঝতে পারলেন ভুবন সোম - সূর্য্য উঠে যাবে পাখী পাওয়া যাবে না । - ৬৪।

ভুবন সোম ভুটাকে তবু আস্তেই চালাতে বললেন । কিন্তু ভুটা সে কথা পাত্তাই দিল না । বরং সোমকে লাঠি দিয়ে জোরে আঘাত করে বকতে লাগলো -

> '.....' বাবু হেনো বুলেছে, শালা বোচা ।' ..... তোঁ মুতি রহনি রেজাই ওড়িকে । কুছ ডর নেহি হে ।'' - ৬৫ ।

ভুটার সোমকে গালাগাল দেওয়ার কথা পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় ছেকাছেনি ভাষার তীক্ষ্ণতার কথা ।

ভুবন সোম চতুর্ভুজ গোপের বাড়িতে পৌঁছলে চতুর্ভুজ তাঁকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে খাটিয়ায় বসাল ।

> তারপর বালিয়া জেলার ভাষাতে যা বললে তা ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায় - বন্দুকের আওয়াজ সে শুনেছে । ও রকম এলোপাতাড়ি আওয়াজ করলে পাখী পাওয়া যাবে না । এই চরে পাখী শিকারের 'ভাজ' ও - রকম নয় । এখানে অন্যরকম কৌশল করতে হবে । রেঁয়া এখানে খেয়েদেয়ে চার পাইয়ের উপর একটু আরাম করুন । তারপর বিদিয়া সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে । ও সব জানে । ওর বয়স একটু কম হ'লে কি হবে, ও খুব চালাক মেয়ে, তবে বড় বদমাশ । কিছুদিন পরেই ওর 'গওনা' হবে, কিন্তু এখনও ওর কোন বিষয়ে নূর (হুঁশ) নেই ।

> কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানে না, কি ক'রে হাঁটতে হয় তাও জানে না । কচি লেবুর (বাছুরের) মত সারাদিন লাফিয়ে বেড়াচ্ছে । ..... তারপর বিদিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'দহি - চুড়া লাও বেটি । বাবুকে খিয়াও ।'

- ৬৬।

বাংলা ভাষার মত হিন্দী ভাষাও অঞ্চল ভেদে খানিকটা পৃথক হয় । উপরের অংশে বনফুল চতুর্ভুজ গোপের বঙ-ব্যের বাঙলা ভাবানুবাদ লিখেছেন। তিনি বাঙলা ভাবানুবাদের মধ্যে মূল বঙ-ব্যের সঙ্গে ওতপ্রোত হিন্দী শব্দগুলো রেখে দিয়েছেন । তিনি অনায়াসে পাখী শিকারের ডাঁজ, রোঁয়া, চারপাই, গওনা, লুর, লেবুর শব্দগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ দিয়ে অনুবাদ করতে পারতেন - কিন্তু করেন নি । এর ফলে উপন্যাসের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটেনি বরং স্থানিক রঙ এর ছোঁয়ায় সরসতা বেড়েছে , পাঠকের আগ্রহও বেড়েছে বলে আমার বিশ্বাস, অথচ চতুর্ভুজের পুরো বঙ-ব্য বালিয়া জেলার হিন্দী ভাষায় লিখলে চলতো না । কৌশলের দিক থেকেও না, বাস্তবতার বিচারেও না । কারণ পাঠকের কাছে সেটা দুর্বোধ্য হত ; ফলে রসহীনও হত । এখানেই বনফুলের নিজস্বরীতির সার্থকতা । ঠিক এই রীতিই দেখা যায়'অধিকলাল' উপন্যাসে ।

> ভগবতী দেবী বাহির হইয়া দেখিলেন সমুন্দরি একটা টাংক মাথায় বহিয়া আনিয়াছে ।
>
> ''কি সমুন্দরি ও টাংক কার ?''
>
> ''হামার ।''
>
> সমুন্দরি অতি কষ্টে টাংকটা বারান্দার উপর নামাইল । তাহার পর অধিকলালের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল -'' ওই ছোঁড়া পুতাটা (ছোঁড়াটা) আজ জাহাজ -ঘাটে কুলির কাজ করতে গিয়েছিল । কাল আপনারা দশজনে ডেকে ওকে কত খাতির করলেন, আজ সকালে ওর এই বুদ্ধি । বলছে আমি ভিখ মেগে [ভিক্ষে করে'] খাব, তবু কুলিগিরি করব । জানেন মাইজি, কুত্তার দুম [কুকুরের লেজ] কখনও সিধা [সোজা] হয় না । মগর [কিন্তু] আমি ওকে সিধা করব ।

তাই এই ''পেটারি'' [ট্রাংক] ভুয়ে [বয়ে] নিয়ে এসেছি। হামার 'জ্যাদনি উমার' [যৌবন কাল] থেকে 'যেতো' [যত] 'জেবর' [গহনা] গড়িয়েছি সব ওই পেটারির ভিতর আছে। হাজার ভরির কম হবে না। সব চাঁদির [রুপার] জেবর। তা ছাড়া পাঁচশ টাকা নগদ। আমি 'সোভই' [সবই] ছোঁড়াগুতার হাতে দিয়ে দিচ্ছি, কারো কাছে তোকে ভিখ মাংতে হোবে না। তুই কত পড়বি পড়। ''

- ৬৭।

কোথাও হিন্দী মূলশব্দ কয়েকটা রেখে বাংলায় লিখেছেন। কখনও দু চারটে হিন্দী বাক্য ব্যবহার করেছেন বিশেষ করে বাঙালী - বিহারীর কথোপকথনে। কোথাও ওপরের মত হিন্দী শব্দের পাশে বন্ধনীবদ্ধ বাংলা প্রতিশব্দ লিখে দিয়েছেন। পূর্বালোচিত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' এবং 'অযাচী সন্ধানে' উপন্যাসেও উপরি - উক্ত পদ্ধতির সাক্ষাৎ মেলে।

''কথাশিল্পের স্পন্দিত গতিশীল রম্য ও প্রাণবন্ত রূপটির সঙ্গেই ভাষার আলোচ্য মোহিনী শক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত।'' ভাষা যে কত শক্তি-শালী - ৬৮। এবং উপন্যাস রচনায় ভাষার শিল্প সম্মত প্রয়োগে ঔপন্যাসিক যে কত বড় শিল্পী, সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর অবিস্মরনীয় সৃষ্টি 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' এ তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 'ঢোঁড়াই চরিত - মানস' এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার ভাষার আকর্ষণ এ ক্ষেত্রে কম নয়। এই উপন্যাসটি পড়লে বিস্মিত হতে হয়, মুগ্ধ হয়ে ভাবতে হয় এ ভাষা ছাড়া তাংমাটুলির তাংমা এবং ধাঙড়টুলির ধাঙড়দের কথা অত সুন্দর ভাবে বলা যেত কি!

'' Language is a social product, not a radical one, it grew up to allow the members of a community."

- ৬৯।

বাংলা ও পূর্ণিয়ার তাংমা - ধাঙড়দের কথ্য হিন্দীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক নব - ভাষার মাধ্যমে বিহারের তাংমাদের সমাজ ও জীবনকে খুঁটিনাটিভাবে চিত্রিত করেছেন - ''ঢোঁড়াই চরিত মানস'' এ- যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, নিবিড় সহা - নুভূতি ও গভীর জীবনবোধের সমন্বয়ে সম্ভব হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের

ইতিহাসে এ সৃষ্টি তুলনাহীন ।

সতীনাথ ভাদুড়ীর নিজের মতে, '' ঢোঁড়াইচরিতমানস'' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা । তবুও একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে তাঁর সব উপন্যাসের ভাষা - রীতিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট । সতীনাথের প্রথম উপন্যাস এবং রাজনৈতিক উপন্যাস 'জাগরী'র ভাষাও আলোচনার অপেক্ষা রাখে । ড: সন্তোষ মজুমদার তাঁর 'সতীনাথ, জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'জাগরী' সম্পর্কে লিখেছেন -

> জাগরীতে আর একটা বিশেষত্ব লক্ষণীয়, বাংলা উপন্যাসে যা ক্বচিৎ পাওয়া যায় । লেখক স্থানীয় বর্ণ বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলবার জন্য উপন্যাসের স্থলে স্থলে হিন্দী শব্দ প্রয়োগ করেছেন ।
> - ৭০।

যেমন - পূর্নিয়া সেন্ট্রাল জেলের দেওয়াল সম্পর্কে বিনুর জবানিতে সতীনাথ লিখেছেন -

> পূর্নিয়া সেন্ট্রাল জেল, বিহার । ..... আমার সম্মুখের প্রাচীর আরও উচুঁ করিবার কাজ দেওয়া হইবে - হুকুম হইবে 'ঔর উচাঁ, ঔর ভী উঁচা, জ্বুরৎ পড়ে তো, আসমান তক ভিড়া দো ।'
> - ৭১।

জেলের মধ্যে বিভিন্ন জেলকর্মীরা কর্মোপলক্ষে যখনই কথা বলেছে, - হিন্দীতেই বলেছে -

> গুমটির উপর হইতে একজন ওয়ার্ডার একটানা চিৎকার করিয়া চলিয়াছে - 'বোলোরে নয়াগোন , বোলোরে জুভেনিন (Juvenile Ward) ... ।'
> - ৭২।

'জাগরী' উপন্যাসের ২১ - ৩০ পৃষ্ঠায় জেলের আসামীরা কিছু নিয়ম - ভঙ্গের অপরাধে জেলের ওয়ার্ডার, ঘাট ও অন্যান্য জেলকর্মচারীদের মৃদু লাঠিচার্জের যে বর্ণনা আছে, অত্যন্ত সরল ও সাবলীল ভাষায় সতীনাথ তা জীবন্ত করে তুলেছেন । সেখানে যথাস্থানে বিহারীদের মুখের হিন্দীবাক্য এবং ঘটনা ও পরিবেশ বোঝাতে হিন্দীবাক্য বা শব্দ প্রয়োগে বিষয়বস্তুকে অনুপুঙ্খ করেছেন । হিন্দী

ভাষায় অগাধ জ্ঞান এবং স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তাকে এ কাজে সাহায্য করেছে। নিম্নলিখিত উক্তি-টি লক্ষ্য করা যাক -

> একটু মিটিকা তেল (কেরোসিন তেল) বদনমে (শরীরে) লাগাইয়া লউন না কেন ?
> - ৭৩।
>
> (হিন্দী শব্দ মিশ্রিত বাক্য)

> জোয়ান, বুঢ়া ভি শালা, হয় ভি শালা ;
> সৈ সব শালাসে মাফী মাঙ্গতা হুঁ।
> - ৭৪।
>
> (পূর্ণ হিন্দী বাক্য)

জেলের মধ্যে আসামীদের সন্ধ্যার কীর্তন ও গান -

'' রাষ্ট্রগগনকী দিব্বিয় জিয়োতি রাষ্ট্রীয় পতাকা নমো নমো ....'' - ৭৫।

ভাষাই মানুষের সংস্কৃতি ও ভাবের মিলন ঘটায় -

> ' স্করসোয়তি কি ইস্কুল ; ভেরি ব্যাড ভেরি ব্যাড টিচার কুল' -
> এই পদ্যবলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বিল্লু এসে রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়াল। তবু কি মেয়ের ঘুর্‌নি থামে ! ঐ ঘুরতে ঘুরতেই বিল্লুর কথায় পাল্টা জবাব দেওয়া হল -
> 'ম্যাও ম্যাও ম্যাও কু ;
> বিল্লি ভাইয়া খ্যাওকু। - গ্রাম্য বালক বালিকারা কানামাছি খেলার মতো একটি খেলা করে। তাহাতে ছেলে-মেয়েরা এই কথাটি বলিয়া চোখ-বাঁধা লোকটিকে মাড়া দেয়।
> - ৭৬।

জাগরী উপন্যাসে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী ব্যবহার সম্পর্কে সতীনাথ নিজেই জাগরীর ভূমিকায় লিখে গেছেন - '' স্থানীয় বর্ণ-বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেক স্থলে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।'' বাংলা বাক্যের মধ্যে

বিশিষ্টার্থক স্থানীয় (হিন্দী) শব্দগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহারে স্থানিক রঙের প্রকাশ ঘটেছে আর পরিচয় ঘটেছে সেই সংস্কৃতির সঙ্গে যা লেখকের শুধুই অভিজ্ঞতা নয় - যা ভাষা, আচার, সংস্কার, রীতিনীতি, বিশ্বাস ইত্যাদি সমস্ত কিছুর একটা সামগ্রিক রূপ - যার মধ্যে তিনি লালিত হয়েছেন, যা দেখেছেন, জেনেছেন, অনুভব করেছেন - তার ছাপ বহন করেছেন। নিম্নোক্ত পংক্তি কটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে একটা জাতির কুসংস্কার, গরীবদের ওপর ধনীর অত্যাচার ও জুলুম প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক পটভূমি - ভাষা এখানে ইঙ্গিতময়।

> .....'মাশ্বাতো' তামাকের মতো চমৎকার হবে। তাই এই জমির উপর নজর। 'সুরুখ' ছিল তেলী। জোয়ান ছেলে সুরুখ থাকতেই মরে যায়। 'পুতহু'র তখন ছেলে পেটে। এক বছরের মধ্যে আমার 'সুরুখ' মরল; তারপর গেল 'পুতহু'। বছর না ঘুরতেই একরত্তি নাতিটিরও 'বাই উখর গিয়া।' যে চব্বিশ ঘণ্টা দাদীর কোলেই থাকত। কত ওষুধ, কত চিকিৎসা হল। ব্যথা লাগবে বলে বাছাকে 'সুই' দিতে দিইনি। দিলে হয়তো বাঁচত। তাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। পাড়ার গোরে গোপের ছেলে তার কিছুদিন পরে মারা যায়। তখন কপিলদেও পথও রায়তি করে আমার উপর 'ইলজাম' লাগাল যে আমি ডাইনি; .....।
>
> - ৭৭।

'ঢোঁড়াইচরিতমানস' উপন্যাসের বাকরীতি বাঙলা - 'আঞ্চলিক উপভাষার বিশেষ অর্থবহ শব্দের সুষম প্রয়োগে' উপন্যাসের ভাষাশৈলী ও রূপনির্মিতির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। ঢোঁড়াই চরিত মানসের ভাষা বিষয়ে ড: সন্তোষকুমার মজুমদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

> তাঁর চিন্তার ভঙ্গী, লেখার ভাষার ছাঁদ আশ্চর্য বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত। ভাষার গালীনতাও লক্ষণীয় কারণ সাধারণত: আঞ্চলিক ভাষায় নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীগণের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনায় সুরুচির অভাব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবতাকে বিসর্জন না দিয়ে ভাষায় ও চিন্তায় গালীনতা রক্ষা করে এই প্রকারের সাহিত্য রচনা করার শিল্পকৌশল অভিনব। - ৭৮

উপন্যাসটির আরম্ভটাই অতুলনীয় -

জিয়ানিয়ার বিবরণ

> অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিয়ানিয়া । রামচরিতমানসে[১] এর নাম লেখা আছে 'জৌনারণ্য' । পড়তে না পারো তো যিমিরজীকে দিয়ে পড়িয়ে নিও । তখনও যা ছিল, এখনও প্রায় তাই । বালিয়াড়ি জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল । রেলগাড়ি ইস্টিশানে পৌঁছবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে 'জঙ্গল আ গেয়া, জিয়ানিয়া আ গেয়া' (জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিয়ানিয়া এসে গিয়েছে)। তাৎমাটুলির লোকেরা একেই বলে 'টৌন' (টাউন) । যেমন - তেমন হেঁজিপেঁজি শহর নয় - 'ভারী সাহার',[২] পীরগঞ্জ থেকেও বড়, বিসারিয়া থেকেও বড় ।
>
> - ৭১।

লেখক প্রদত্ত টীকা

১। তুলসীদাসজীর লেখা রামায়ণের নাম 'রামচরিত মানস' । ভারতবর্ষের মধ্যে রামচরিত মানসই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় বই। রামচরিত্র মানসসরোবরের ন্যায় বিশাল । এর ভিতর রামকথা - রূপ হাঁস ঘুরে বেড়ায় ।

২। প্রকাণ্ড শহর ।

'ঢোঁড়াইচরিতমানস' সম্পর্কে গ্রন্থাবলী (২য়)'র প্রথমে 'সতীনাথ ভাদুড়ী : নিঃসঙ্গ দীপিকা'য় সম্পাদক লিখেছেন - ''এ কেমন উপন্যাস যার পাতায় পাতায় দরকার হয় পাদটীকার ? এ কেমন উপন্যাস যার নায়কের নাম ''ঢোঁড়াই ?'' এই 'পাদটীকা' লেখক পাঠকের কথা চিন্তা করেই দিয়েছেন । তা না হলে উপন্যাসের ভাষা আকর্ষণীয় না হয়ে গুরুভার হতে পারত । বাঙালী লেখকের পর - বাসে বাস বাংলা সাহিত্য - ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেছে - ভৌগোলিক পরিবেশ, ঘটনার বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভিজ্ঞতা সংযোজিত হয়েতো বটেই উপরন্তু ভাষা - ব্যঞ্জনার নতুনত্বেও । দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল - ঢোঁড়াই - এর বাপ, তার মা বুধনীর সঙ্গে গল্প করতে বসে -

'বকড় - হাট্টা - আ - আ
বড়দ - বাট্টা - আ -আ
সো জা পাঠ্ঠা - আ - আ
(ছাগলের হাট, বলদের চলার পথ, শুয়ে পড় জোয়ান),
ঘুম পাড়ানী গান শুনতে শুনতে ছোট্ট ঢোঁড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে বাপের কোলে। বুঝলি বুধনী এ ছোঁড়া বড় হয়ে আমার বংশের নাম রাখবে। - ঘুমন্ত ছেলের গালদুটো টিপে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে ' ওনামাসি ধং গুরুজী পড়হং ; - কিরে পড়বি ?'[২]

লেখক প্রদত্ত টীকা

২। পড়া আরম্ভ করার সময়, এদেশের ছেলেদের 'ওম্ নমস্ সিদ্ধং' বলে আরম্ভ করতে হয়। ছেলেরা তার মানে বোঝে না। তারা বিকৃতভাবে কথাটা উচ্চারণ করে 'ওনামাসি ধং গুরুজী পড়হং' বলে পণ্ডিতমশায়কে চটায়।''
- ৮০।

ঢোঁড়াই - এর বাপ মারা গেলে বুধনীর চুমৌনার পর ঢোঁড়াই 'বৌকা - বাওয়া'র আশ্রয়ে ঠাঁই পায়। তার সঙ্গে ভিক্ষে করে বেড়ায়। ভিক্ষে করার সময় গান গাইতে হয়।

ঢোঁড়াই গান গাইছে .....
সুন্দরা আসু। ভূমি ভাইয়া - আ।
ভারাতা - আ কে। দেশা - বাসে।
মোরা প্রাণা - আ। বসে হিম - অ
খো হরে বটোহিয়া - আ - আ ....।[১]

লেখক প্রদত্ত টীকা

১ - সুন্দর সুভূমি ভারত দেশটা,
আমার প্রাণ থেকে হিমালয়ের গুহায়,
রে পথিক। ....
৮১।

স্বরাজ আন্দোলনে তখন গ্রামে গঞ্জের সর্বস্তরের মানুষ সামিল হতে শুরু করেছে। সেই সুযোগে গ্রামের মহতো নিজেকে গান্ধীজির ভক্ত বানিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে নিজেদের প্রতিপত্তি দেখাতে চেষ্টা করে ; কিন্তু সার্থক হয় না। সতীনাথ ঢোঁড়াই - এর ভাষায় উক্ত ঘটনা প্রকাশ করেছেন -

> শুয়োরখোর, মুর্গীখোর লোকগুলোকে গান্ধী বাওয়ার নামে নিজেদের প্রতিপত্তি দেখাতে গিয়েছিল দুই নতুন 'ভক্ত'। গিয়েই তাদের বলে যে, তোদের শুয়োর - মুর্গী ছাড়তে হবে - গান্ধী বাওয়ার হুকুম মাস্টারসাবও সসুরার[১] থেকে বেরিয়ে বলেছে। জয়সোয়াল সোডা কোম্পানিতে কাজ করে বুড়ো এতোয়ারী। সে ফোকলা দাঁতে হেসেই কুটি কুটি। আরে গান্ধী বাওয়া তোদের 'খত'[২] দিয়েছে নাকিরে ? তাহলে ডাকপিয়ন এসেছে বল, তোদের পাড়ায়। শনিচরা ধাঙড় বলে - 'লে ডিগি ডিগি! তাই বল! মহতো 'ভক্ত' হয়েছিস। ছাড়িদারও দেখছি তাই। 'বিলি ভক্ত আর বগুলাভকৎ'।[১] তাই গান্ধী বাওয়ার হুকুম ফলাতে এসেছিস। পরশু তো ছাড়িদারকে 'কলালীতে'[২] দেখেছি সাঁঝের পর'।

লেখক প্রদত্ত টীকা : ৩৫ পৃঃ ১ শুশুরবাড়ি ; এখানে জেলখানা।
'' ২ চিঠি।
৩৬ পৃঃ ১ বিড়াল তপস্বী আর বকধার্মিক
'' ২ মদের দোকান।
- ৮২।

ঘটনার সঙ্গে ভাষারও এখানে একটা ঐতিহাসিক মূল্য রয়ে গেছে।

বিভিন্ন উপন্যাসে সতীনাথ নিম্নলিখিত শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন - টোকরী, নারা, আওরৎ কিতা, বুড়বক, ঠিকা চৌপল, পরণাম, নিমক সত্যাগ্রহ, কদ্দুচোর, দামলী কিতা, টোলী, কবায়ৎ, এতোয়ার, ঘায়েল, কসুর, ইস্তফা, হজামৎ, বুৎবু, ভানসা ঘর, নাজুক ফলই, সাপ্তালীন, চমাইন, বোলবলা, বেটা ফিরিয়া, বালবাচ্চা, মবেশীর চরী, মেহনতানা, বাটাইদার, নকস্, বাহালী,

চরবাহা ইত্যাদি (জাগরী)। আজাজী, রোয়েদাদ, আজাদ, কায়েমী দখল (চিত্রগুপ্তের ফাইল)। সকলেই কমবেশী হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সতীনাথ এ বিষয়ে সবার ওপরে। 'অচিনরাগিনী' উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ী বিহারের কথ্য বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের কথ্য বাংলা ভাষার পার্থক্য খুব সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন পিলের ভাবানুষঙ্গে। পূর্ব অধ্যায়ে নতুনদিদিমার চরিত্র আলোচনার সময়ে বাংলা ভাষার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। এক জায়গায় তিনি লিখছেন -

> বলেই মনে হল নতুনদিদিমা বলেন 'বাটনা বাটা' ; 'মসলা পেষা' কথাটা বোধ হয় ঠিক বাংলাদেশের কথা নয়।
> - ৮৩।

অনেক সময় ঔপন্যাসিকের বর্ণনীয় ঘটনাস্থলের ভৌগোলিক অবস্থান ও বিশেষত্ব বিশেষ ভাষা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই পরিস্ফুট হয়। যেমন -

> ..... যেন বাইরের হৈ-হৈ-সভ্য- ভব্যতার থেকে ফেরার হয়ে একটা শান্ত নিরালা এখানে এসে শালের হাওয়াতে খুশী হয়ে পড়ে আছে। একটা হালুয়াইয়ের দোকান, একটা সরাই-ঘর আর একটা মহুয়া-চোলাই-ভাঁটি। মাটির দেওয়াল ও খাপরার চালা দিয়ে তৈরী তিনটে ফুদে চেহারার বাড়িতে শুধু তিনটে মানুষ বাস করে, - হালুয়াই রামসিংহাসন, সরাইওয়ালা হীরারাম আর ভাঁটিদার গুলুমিয়াঁ।
> - ৮৪।

ওপরের বর্ণনায় কিছু না জানা থাকলেও 'শালের হাওয়া', 'হালুয়াইয়ের দোকান', 'মহুয়া-চোলাই ভাঁটি', 'খাপরার চালা' - শব্দগুলোর ব্যবহারে উপন্যাসের নির্বাচিত সংস্থান যে বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে সে কথা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সুবোধ ঘোষের 'কান্তিধারা', পুনর্ণবা, 'জলকমল' উপন্যাসে 'চটান' শব্দটির ব্যবহার আছে যা হিন্দী 'চ্টান' শব্দ থেকে আগত বলে মনে হয়। (चट्टान পুং-পাহাড়ের উপর সমতল পাথর, বিস্তীর্ণ শিলাভূমি) শব্দটির ব্যবহার নিম্নলিখিতরূপে করা হয়েছে - ''..... নদীর

চটানে ....." (জলকমল,) " ..... পাথরের চটানে পা কেটে কেটে ..." (পুনর্ণবা)। সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত আঞ্চলিক উপন্যাস 'শতকিয়া'য় বহু বাংলা শব্দ হিন্দী রীতিতে স্ত্রীলিঙ্গান্তর করে ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন - সরদারিন, হালদারিন, বাঘিন, শিয়ালিন, ঠগিন, গাঁওয়ারিন ইত্যাদি। ঐ শব্দগুলোর পুংলিঙ্গবাচক শব্দগুলো হল - সরদার, হালদার, বাঘ, শিয়াল, ঠগ, গাঁওয়ার ইত্যাদি। কথ্য ভাষাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দাদুদের সমাজব্যবস্থায় বহু ভাল নিয়ম আছে। অকৃত্রিম কল্যানকর সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে দেবী যাযাবর্যের ভণ্ডামির অন্তরালে নতুন শোষণব্যবস্থা চালু করার চেষ্টায় আছে বাবু দুখন সিং। কিন্তু দাদুর মত অন্যান্য সাধারণ মানুষরা জাতপথকেই চাইছে; 'জাতের সুধার' চাইছে না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংলাপ : ভাষা লক্ষণীয়।

> - কিন্তু আহিরখানে কুঁড়া বলি দিব। হাতডুলে হাঁক দেয় দাদু!
> - নিশ্চয় দিব। চেঁচিয়ে সাড়া দেয় জাতপথ। সোরগোল ওঠে।
> এক একটা প্রতিবাদের শব্দ আর্তনাদের সুরে ফেটে পড়তে থাকে।
> গাঁয়ের সব মেয়ে রোজ নাচবে। নিশ্চয় নাচবে।
> - বেটা - বেটির বিয়াতে বামনের দরকার নাই।
> - কোন দরকার নাই।
> - বামন পুষবার পয়সা নাই।
> - বেটি - বহিন ডাগর হবে, তবে বিয়া হবে।
> - নিশ্চয় হবে। রাটির বিয়া হবে, সাগাই বিয়া হবে। সব হবে।
> যেমনটি হয়ে এসেছে - তেমনটি হবে। জাতের সুধার চাইনা।
> - ৮৫।

পলুসের ঘরে অল্প সহ্য মুরলী নিজের সন্তানের নিরাশ্রয় তার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়েছে - বিয়ের আগে মুরলী বুঝতে পারেনি পলুস দাদুর সন্তানকে এমন করে ঘৃণায় অনাথ-আশ্রমের দিকে ঠেলে দেবে - সে অনুনয় করেছে - পলুসের ঘরে মুরলীর সঙ্গে তার সন্তানকেও আশ্রয় দিতে। কিন্তু পলুস অনমনীয় - সে মুরলীকে ভালবাসে! তার সন্তানকে নয়। তার কথায় তার মন ধরা পড়ে -

(১) ভেবেছে কি জোহানা ? হারানগঞ্জের এই রাতের আঁধারও একটা জঙ্গল ? এই সড়কটা কি গাঁয়ের ক্ষেত ? আর সময়টা কি ভুঁইমানতের লজ্জাহীন লগন ?

- ৮৬।

(২) পলুসের মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস করে মুরলী - পলুসের কানের কাছে একটা সফল স্বপ্নের আনন্দ ফিসফিস করে শুনিয়ে দেয় মুরলী : হ্যাঁ পলুস, এ ঘর আমার মরদের ঘর বটে । আমার ছেইলার বাপ বট তুমি! মুরলীর হাতের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসে পলুস ; তারপর একটা লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে যায় । যেন পলুসের গায়ে ভয়ানক এক অপমানের জ্বালা লেগেছে । মুরলীর এই তৃপ্তির ভাষা যে মধুকুপির কিষাণীর রাতের গতরের বুনো আহ্লাদের একটা চিৎকার । পলুসের কাছ থেকে নয়, জোহানার পেটের ছেইলাকে নিজের ছেইলা বলে মেনে নিয়ে আদরেরর ঘরে ঠাঁই দিতে রাজি হয়েছে যে, তার কাছ থেকে কত সহজে সুখ নিয়ে খুশি হয়ে গেল জোহানার গা-গতর আর প্রাণ ! ওর নামটা জোহানা, প্রাণটা মুরলী ।

- ৮৭।

দাশুদের গায়ে ঈশান মোক্তার একজন সুদেখোর মহাজন । যুদ্ধের বাজারে পয়সা হয়ে বড়লোক দুখন সিং আরও বড়লোক হয়ে গেল । এরা গ্রামের মাতব্বর হয়ে উঠলো । কিন্তু দরিদ্র অশিক্ষিত সরল গ্রামবাসীরা এদের দ্বারা শোষিত হয়ে নিঃস্ব হয়ে গেল - তারা তাদের দুর্গতির জন্য কে দায়ী বোঝে । তাদের পরিস্থিতি তারা নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করেছে -

বাবু দুখন সিংয়ের দয়ার জল খেয়ে খেয়ে কত মোটা হয়ে গিয়েছিল জটা রাখালের চেহারা । সেই চেহারা মরাশালের চেহারার মত শুকনো খটখটে হয়ে গিয়েছে । দুখনবাবুর মতলবের সাথী হয়ে নতুন জাতপথও করেছিল, জাতিয়া হয়েছিল ; আর বনচণ্ডীর ভক্ত হয়ে বামন মেনেছিল যে জটা রাখাল তার আবার এমন দশাটি হয় কেন ?

> এই জটা রাখালইতো সেই নতুন পঞ্চের মানুষ যে পঞ্চ একটা বড়াইয়ের নিয়ম করেছিল, ভাত-ভাইয়ারীতে খাদিয়া আর কুঁকুড়াশিদের সাথে এক ঠাঁই বসবে না জাতিয়ারা। ঈশান মোক্তারের জমিতে মনিষ খেটে বড় সুখে থাকবে ওরা, সে আশা আজ ভিখ্‌মজুর হয়ে যায় কেন? - ৮৮।

নবজাতপঞ্চ'র নিয়মের বিরুদ্ধে চাষী সোচ্চার -

> মিলতি জোতের চাষী হলে আমার ঘর ধাওড়া হয়ে যাবে; আমার সব সাধের উপর মিলতির মার পড়বে। আমার মাগ আর আমার ছেইলাও মিলতির হিস্যা হয়ে যাবে। - ৮৯।

খরা প্রকোপ চলছে বৃষ্টির আশায় দিন গুনছে মধুকুপির কৃষাণ কৃষাণী -

> ভোর তো হবে, কিন্তু কালা বাদল আবার দেখা দিবে কি? ভাদুয়া মেঘ গলবে কি? আর ডরানির জল পাগল হয়ে হুড়পা বান বহাবে কি? - ৯০,

সুবোধ ঘোষের অন্যান্য উপন্যাসে হিন্দী ভাষা কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়েছে -, তবে 'শতকিয়া'র ভাষারীতি মৌলিকতা দাবী করতে পারে। সেইজন্য 'শতকিয়া'র ভাষার আলোচনাই মূলত: করা হল। এই প্রসঙ্গে ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয় - '' উপন্যাসটির সংলাপে ও চরিত্রের জীবন আলোচনায় এই অঞ্চলের আদিম গোষ্ঠীর বাগরীতি উহার চিত্রলতা ও ব্যঞ্জনাধর্ম লইয়া চমৎকার ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।'' - ৯১। এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় - '' এই অঞ্চল'' বলতে তিনি মানভূম অঞ্চল বুঝিয়েছেন।

সবশেষে বিমল করের কথা। তিনি তাঁর উপন্যাসে বিহারের বিভিন্ন স্থানের প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু দ্বিতীয় ভাষারূপে হিন্দীকে ততখানি গুরুত্ব দেন নি। তবে তিনি বিহারে মানুষ হয়েছেন - '' বাঙালী - অবাঙালী সমাজের মিশ্র-পরিবেশ'' এর প্রভাব তাঁর ওপরও পড়েছে - তার চিহ্ন তাঁর রচিত কথা - সাহিত্যে কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। ''খড়কুটো'' উপন্যাসে অমল ভ্রমরদের - ৯২।

বাড়ীতে ছুটিতে বেড়াতে এসেছে - দেওয়ালীর দিন দুজনে বেরিয়েছে বাজী পোড়ানো দেখতে । ভ্রমররা বাঙলাদেশের বাইরে বিহারের একটা স্থানে বাস করে । টাঙা করে ফিরছে - ''মোতি রোড ; কালেক্ট - । ভ্রমর টাঙা অলাকে পথ বলে দিল ।'' বাংলাদেশ হলে 'কলেক্ট' বলত, 'কালেজ' বলত না । 'দুদ' উপন্যাসে পরেশনাথ মেন্টাল হস্পিটালে এক প্রৌঢ় বিহারী পাগল চীৎকার করছে - - ১৩।

> ডাকু হ্যায় - ইয়ে সব ডাকু হ্যায় - ছিনা লিয়া - বিলকুল রূপাইয়া হামারা চোরি ক'রকে পানি মে গিরা দিয়া-দে দেও - আগর ...।
>
> ১৪।

ভ্রমরের অসুখের কথা কৃষ্ণাকে অমন জানানো কিন্তু - ''ওর হরদম বিমার হয় ।'' কৃষ্ণা গা করেন না যেন ।'' বিহারের প্রবাসী বাঙালীরা কথা বলতে বলতে হিন্দী শব্দ প্রায় ব্যবহার করেন । - ১৫। 'পূর্ণ -অপূর্ণ' উপন্যাসে রামেশ্বর পিয়ন একটা চিঠির ঠিকানা ঠিকমত পড়তে না পেরে বিজলীবাবুকে খামটা দিল দেখতে - যদি বলতে পারে । বিজলীবাবু ভাল করে দেখে বললেন, -

> '' বিজলী অফিসের সাহেবের বলেই তো মনে হচ্ছে - মিত্তির সাহেব ।"
> '' মিত্তির সাহাব ! .... হামরা ডি ওহসি মালুম হোথা থা । .... সাহেব কো এক রসিদ ডি হ্যায় । ''
> '' কিসের রসিদ ?''
> '' মানি অর্ডারকা ।''
>
> - ১৬।

এরকম অল্প স্বল্প হিন্দী কথা তাঁর লেখায় দেখা যায় ।

বর্ণনা বা কথোপকথন ছাড়া ভাষার কারুকার্য উপন্যাসে ব্যবহৃত গীত, ছড়া, উৎসবের গান ইত্যাদিতে খুব দেখা যায় । বিহারবাসী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের বিভিন্ন নায়ক -নায়িকার কণ্ঠে গীত গানগুলো সবই হিন্দী 'গীত'। যেমন নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ''ভ্রমর সিংহ'' উপন্যাসে -

রানীকে দেখিয়া একটু হাসিলেন । হাসিয়া গাহিলেন -

'' সইয়া ঘর না আয়ে বরস গয়ে অদরা''*

.....

'' বড়ে বড়ে বুঁদে বরস গয়ে বদরা ;

ভিঁজে মোরে চুনরী ভিঁজে মোরে অঁচরা ।''

''* এই গান গ্রন্থকারের রচিত নহে । বেহার প্রদেশে ইহা অদ্যাবধি গীত হইয়া থাকে । 'অদরা' আদ্রার অপভ্রংশ ।''

- ১৭।

এই গীতেই উপন্যাসের প্রধান খীম ধরা পড়েছে । এর সমর্থনে ড: রামদুলাল বসুর বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে - '' স্বামীর জন্য রানীর সাময়িক প্রতীক্ষা ও লছমীর চিরদিনের প্রতীক্ষার সুর তার গানে বেজে ওঠে 'সইয়া ঘর না আয়ে বরস গয়ে অদরা' ইত্যাদি'' । নগেন্দ্রনাথের ''বন্ধু'' উপন্যাসেও গীতই

- ১৮।

উপন্যাসকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে । একটু পরিচয় দিলে বক্তব্য পরিস্ফুট হবে ।

বর্ষা সবে আরম্ভ হইয়াছে, এখনও গঙ্গা ও বর্ষার জল মিশিয়া চারিদিকে জলাকীর্ণ হয় নাই । .... গ্রামে গ্রামে বৃক্ষে বৃক্ষে হিন্দোলা ঝুলিতেছে ; বালক বালিকা, যুবক যুবতী দোল খাইতেছে । স্ত্রীলোকেরা মিলিয়া সাবণে কজরি গাহিতেছে - '' আইর সাওয়ন কি মহীনওঁয়া সব সখী খেলৈ কজরি ।''

- ১৯।

যাহারা সুভাগীকে দোলাইতেছিল তাহারা কজরি গাহিতেছিল। রোশন ও মোহন তাহাদের দর্শনাতীত হইতেই সুভাগী কজরির সুর ভঙ্গ করিয়া অন্য সুর গাহিল,

''শ্যামলিয়া কি লটকী চাল জিয়া যে মেরো বস গইরে .

তন মন হিয়া যে বস গইরে .

- ১০০।

রোশন হৃদয়ের আবেগে গাহিয়া উঠিল,

'' তুনে আঁখ বতাকে যারা ঝুকে,
দিয়া পলক পলক ইশারা ঝুকে ! ''
- ১০১।

উপন্যাসের শেষেও 'গীত'।

মোহন ও রোশন গ্রামে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে কে গায়িল,
'' মন বনরা সে উদাস ভয়ে,
কেয়া করুঁ মত বাঁওয়রিয়া ।''
- ১০২।

'গীতের মত হিন্দী প্রবচনও বিহারবাসী সাহিত্যিকদের উপন্যাসে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে । রসসৃজনে প্রবচনের ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য । উদ্ধৃতিই এ বিষয়ে প্রধান প্রমাণ । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সন্ন্যাসীদের ভাঙ-গাঁজার আড্ডায় ভাঙ খাওয়া তাদের কাছে কতটা আনন্দদায়ক বোঝানোর জন্য সে সম্পর্কে কতগুলো হিন্দী বয়েৎ উদ্ধৃত করেছেন ।
একজন ভন্ড সন্ন্যাসী তার শিষ্যদের বলছে -

(১) জিস্‌নে ইস্‌ দুনিয়ামে আ-কর্‌ একদিন ভি পিয়ে ন ভাঙ
উস্‌নে, সচ্‌ মুছোতে ক্যা দেখা জাহান কা আরঙ ?
- ১০৩।

(২) রামনাম লাড্ডু, গোপাল নাম ঘি,
হরিনাম মিশরি , ঘোর ঘোর পী ।
- ১০৪।

ছড়া ও প্রবচন প্রয়োগে বনফুলের দক্ষতা অতুলনীয় । 'মৃগয়া' উপন্যাসে কুঞ্জ লালের দলের গল্প, স্ফূর্তি ও গানে হিন্দী ছড়া ও পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গল্প করতে করতে দাড়ির জাতি সম্পর্কে কুঞ্জ শ্লোক বলছে -

এক দাড়ি চুটুক পুটুক, এক দাড়ি তক্‌কো
এক দাড়ি মনমোহন এক দাড়ি বড়্‌ডো ! - ১০৫।

'' কুঞ্জর বাবা মজঃফরপুরে চাকরি করেন । কুঞ্জ সেখানে কিছুদিন ছিল । সুতরাং তার কথার মূল্য আছে ।'' একজন আবার শ্লোকের মানে জিজ্ঞেস করেন । কুঞ্জ তখন বলছে -

- ১০৬।

> মানে তো সোজা । চুটুক পুটুক মানে ছিটেফোঁটা, এখানে একগাছা ওখানে একগাছা । তক্কো মানে ছোট্ট ছাগল -দাড়ি, যেমন আমাদের বঙ্কুর । মনমহেশ - বেশ গালভরা মস্ত দাড়ি , কিন্তু বে -এক্তার নয়, আর বড়ডো হচ্ছে একেবারে -
>
> কুঞ্জ ঠিক উপযুক্ত কথাটা খুঁজিয়া পাইতেছিল না ।
>
> ..... গোঁফেরও একটা শ্লোক আছে -
>
> দই চপ চপ কেলা মোচা
>
> উইসা শিঙ্গা উপর খোঁচা
>
> মধ্যে শূন্য মেয়াপাতি
>
> পাঁচটি প্রকার গোঁফের জাতি ।

- ১০৭।

'' তীর্থের কাক'' উপন্যাসের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতাংশ উল্লেখ করা যেতে পারে ।

> ভাগলপুর হইতে আগতা দিদিমা সম্পর্কের স্থূলাঙ্গী এক বয়স্কা বিহারী মহিলা নবকিশোরকে দেখিয়া বিহারী ভাষায় গান গাহিয়া উঠিলেন -
>
> পহুনা আইল রে ননদিয়া পানি দে
>
> মোঢ়া তামাকু দে আম ক্ষীর সানি দে -
>
> [ওগো নন্দী, অতিথি এসেছে, তাকে জল দাও, মোড়া দাও, তামাক দাও, তারপর ক্ষীরের সঙ্গে আম মেখে দাও ।]
>
> তাহার পর তিনি নবকিশোরের থুতনি নাড়িয়া আদর করিয়া হিন্দী ভাষায় বলিলেন - '' এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? লুকিয়ে লুকিয়ে বউ দেখতে গেছলে না কি !'' একটা হাসির কলরব উঠিল । -

১০৮।

মজা হল, নবকিশোর নিজেই বর । মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ে । কলেজ

হস্টেল থেকে বাড়ী আসতে নবকিশোর খুব দেরী করে ফেলেছে । তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'বর' কে রহস্যালাপে আপ্যায়িত করছেন । উত্ত- বিহারী মহিলা নবকিশোরের বিবাহ উপলক্ষে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় এসেছেন । তার ব্যবহার দূর অতিথির মত নয়, নিকট আত্মীয়ের মত । ভাষার বাহিরঙ্গ বিহারী - বাঙালীর পার্থক্য নির্দেশ করলেও অন্তরঙ্গ আবেদন উৎসবের আনন্দ বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে । এইসব প্রবচন ব্যবহার ভাষারীতির শিল্পসুষমাই শুধু বৃদ্ধি করেনি উপন্যাসের গুদাদগুণও বৃদ্ধি করেছে ।

বনফুলের 'দ্বৈরথ' উপন্যাসে অনেক হিন্দী গীতের উল্লেখ আছে । জমিদার চন্দ্রকান্ত এবং তাঁর ভগিনী, উগ্রমোহনের স্ত্রী, উভয়েই রীতিমত সঙ্গীত চর্চা করতেন । সেই উপলক্ষেই এইসব গানের উল্লেখ। দু - একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ।

(১) বুঁদন ভিজে মোরি সারী
অব ঘর জানে দে বনবারি ।
এক ঘন গরজে, দুজে পবন বহত,
তিজে ননদী মোসে দেত গারী ।। - ১০৯।

(২) বৈরন কোয়লিয়া কুহুক ঘরি ঘরি কুহুক । - ১১০ ।

(৩) আধি রাতি রে পাপি হারা
পিয়া পিয়া বোলে - !
পিয়া পিয়া বোলেরে পিয়া
পিয়া পিয়া বিদেশে
কৈ সে ভেনু রে সন্দেশ ! - ১১১। ইত্যাদি ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ''অযাচী সন্ধানে'' উপন্যাসে ছেলে - বেলার ছেলেমানুষীর কথা বলতে গিয়ে 'বাল্যরসনাযোদী মেঠাই' গুলাবছড়ির উল্লেখ করেছেন । মিষ্টিবিক্রেতা গ্রাম্য ছড়া আওড়াতে আওড়াতে ঘন্টা বাজিয়ে ঐ মিষ্টি ফেরি করত - মেঠাইর প্রসঙ্গে সে কথাও তিনি লিখেছেন । লেখকের ভাষায় -

ঘণ্টীর সঙ্গে রসনার মতো কাঁথোদী একটা ছড়া গাইতে গাইতে -

'' গুলাবছড়ি কড়কড় বোলে -
তব লড়কাকে মনুয়া ডোলে -
যায় বাপসে পৈসা যাতে -
খায় গুলাবছড়ি ।'' -

১১২।

বাচ্চাকে তেল মাখাবার ছড়া -

সোনাকে কটোরাযে উপটন তেল, বউয়াকে লাগায় দেলি দশ - বিশ
বের - বাবু, দশ - বিশ বের ..... আরও কত কি সব ।

- ১১৩।

সুবোধ ঘোষের "শতকিয়া" উপন্যাসে কুমুর নাচের কথা আছে । এই নাচের সঙ্গে সাধারণত: গ্রাম্য ছড়া বা আঞ্চলিক ভাষার পল্লীসঙ্গীত গীত হয় । অবিবাহিত যুবক - যুবতী বা স্বামী - স্ত্রী মিলে হাত ধরাধরি করে নাচে । মানভূম - পুরুলিয়া অঞ্চলে এই ধরণের নাচ - গানের প্রচলন আছে । তারই একটি দৃষ্টান্ত এই উপন্যাসে পাই - দাসু ও মুরলী তাদের ক্রমবর্ধমান দূরত্বের মধ্যেও কাছাকাছি হতে পেরেছে নাচ - গানের মধ্যে -

মধুকুপির কিষাণ - কিষাণীর জীবনের কুমুর এতক্ষণে সব অভিশাপের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে নেচে উঠতে পেরেছে । মুরলীর দু'হাত ধরে হেসে হেসে আর দুলে দুলে সুর করে ছড়া গেয়ে ওঠে দাসু -

- তু যাস কুথাকে, হেই কিষানী ।
মুরলী চোখ টিপে হাসে - নাইহর যাব, তহর জানি ।
দাসু - কিসের এত গমর হয় ।
মুরলী - উমর কথর বুড়া নয় ।
দাসু - কিষানী তোর চিকন চুল ।
মুরলী - কে দিবেক কিঙ্গা ফুল ।
দাসু - মোর ঘর যাবি কি ?
মুরলী - মন দিব লিবি কি ?

দাদু - ছল যদি নিব না ।
মুরলী - যৈবন দিব না ।
চেঁচিয়ে ওঠে দাদু - কি বললি ?
দাদুর মুখ একটা হাত দিয়ে চেপে ধরে মুরলী বলে - চুপ কর । - ১১৪।

এই গান ও নাচ ব্যক্তি-গত আনন্দ - স্ফূর্তির উদাহরণ হলেও দাদুদের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয়ও বহন করছে । বিশেষ বিশেষ উৎসব -অনুষ্ঠানে দল বেঁধে সারারাত ধরে নাচ -গানের প্রচলনও আছে ।

মানভূম জেলায় অনেক সাঁওতাল আছে । ভাদ্র মাসে এই অঞ্চলে 'করম' উৎসব হয় । এই উৎসব মুখরদিনগুলোতে আখড়াগুলো মাদলের দিপ্পির দিপাং ধিতাং ধিতাং বোলতানে বাতাসে শব্দের শিহরণ জাগায় - 'করম গাছ ঘিরে ঝুমুর নাচের আসর' মত্ত হয়ে ওঠে - মেয়েরা 'হলুদ ছোপানো' শাড়ি পরে, 'খোপাতে ধানের শিষ' গুঁজে দল বেঁধে ঝুমুর নাচতে যায় - নাচের সঙ্গে গান ওঠে -

দিপ্পির দিপাং
আঁটি আঁটি ধান কাটি কানালির মাটি গো !
কিষাণের ধিয়াপুতা কত সুখে খাটি গো !
হে করম দয়া কর ! - ১১৫।

করম ডালে মেয়েরা জল ঢালে - ঝুমুর গেয়ে আর নেচে সারা হয় । সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' উপন্যাসেও এই উৎসবের কথা জানা যায় । 'বৌ - কাথাই' বৌকাকে বলছে - '' ..... ধাঙড়টোলার 'কর্মধর্মার' নাচ দেখতে যাস না, ওদের মেয়েরা বড় খারাপ ।'' - ১১৬। টীকায় লেখা আছে - 'কর্মাধর্মা' ধাঙড়দের ভাদ্রপূর্ণিমার দিনের উৎসব আর পূজা' । আর 'ধাঙড়টুলির বৃত্তান্ত' অধ্যায়ে ধাঙড়দের পরিচয় জানা যায় -

ধাঙড়দের পূর্বপুরুষরা আসলে ওরাওঁ । কবে সাঁওতাল পরগণা থেকে গঙ্গার এপারে আসে কেউ জানে না । তবে সাঁওতাল পরগণার ওঁরাওদের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার মিল আছে । - ১১৭।

ঢোঁড়াই -রাখিয়ার বিয়েতে বিভিন্ন স্ত্রী -আচার অনুষ্ঠিত হয় ।

সবশেষে - ''বর - কনে দুজনে মিলে উখলিতে ধান ভানে ।'' ২ পাশা - পাশি দাঁড়িয়ে দুজনেই দুহাত দিয়ে 'মাষাট'টাকে ৩ ধরেছে ।

লেখকপ্রদত্ত টীকা ২- উদুখল । ৩ - উদুখলের মুষল ।

মিশিরজী উদুখল থেকে চাল নিয়ে গোনেন - জোড়সংখ্যা হয়েছে - '' এ বিয়ে খুব সুখের হবে ।''

- ১১৮

এরপরই মহতোর রামায়ণ থেকে ছড়া পাঠ এবং মিশিরজীর ছড়া কথন । ছড়া কাটাকাটির অনুষ্ঠানে ছড়াগুলোর ভাষা লক্ষণীয় ।

মহতো ঢুলছিল বসে । সে নেশার আমেজে আছে এখন ।
হঠাৎ চমকে উঠে হড়বড়ে করে বলে ফেলে -
'সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী ।
হোইহি সততি পিয়হি পিয়ারী' ।।
সব সুলক্ষণ আছে এ মেয়ের । এ চিরকাল 'পুরুখে'র পিয়ারী থাকবে ।
এইবার মিশিরজী বলে -
'সদা অচল এহি কর অহিবাতা,
এহি তেঁ জস্থ পইহহিঁ পিতুমাতা ।।
এর এয়োতি অচল থাকবে, এর জন্য এর বাপ - যার নাম হবে ।

- ১১৯।

মহতোর কাছে রাখিয়ার নালিশের ফলে ডাকা পঞ্চায়তিতে সকলে রাখিয়ার সম্পর্কে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করছে । নারীচরিত্র রহস্যময় । বাবুলাল রাখিয়ার সম্পর্কে নিজের বক্তব্য বোঝাবার জন্য রামায়ণ (তুলসীদাসের) থেকে ছড়া কাটে -

'নিজ প্রতিবিম্বু বরুক গহি জাঈ ।
জানি ন জাই নারি গতি ভাই ।।' ৪

| ৪ আকাশের উপরের নিজের ছায়া যদিই বা ধরে রাখা সম্ভব হয় তবুও
| মেয়েদের মনের গতি জানা সম্ভব নয় - তুলসীদাস । ১২৩।

কানাবানী ঘরে যাওয়ায় মধুকুপির সাধারণ অধিবাসীরা খুশী হয়েছিল । একদল গরুচরানী মেয়ে খুশীতে ছড়া কাটছে -

| ডর কেনে ডরানি এল গুড়ুয় ভাই,
| চল পিয়ালিন বিহা করবি কানারানী নাই ।
- ১২১।

বাংলা ভাষা হয়েও আঞ্চলিক সুরটি পৃথক ।

বিহারবাসী বাঙালী লেখকদের বাংলা ভাষা বাংলাদেশের বাংলা লেখকদের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র । এই স্বাতন্ত্র্য শুধু সংলাপে হিন্দীভাষা ব্যবহারেই নয় - হিন্দী শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশের যথাযথ প্রয়োগে বাংলা ভাষার কাঠামোর মধ্যেও নতুনত্ব দেখা যায় । তাঁরা বিহারের প্রাকৃতিক, সামাজিক পটভূমির সঙ্গে উপন্যাসের ভাষায়ও নতুনত্ব এনেছেন । এই অধ্যায়ের আলোচনায় সেটাই আমরা উপস্থাপিত করলাম ।

পঞ্চম অধ্যায়

উল্লেখপঞ্জি

১। '' বাংলা উপন্যাসের রূপ-কল্প ও প্রযুক্তি-'' — ড: কার্তিক লাহিড়ী — পৃ: ২২১
সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭১

২। ঐ — ঐ — পৃ: ২৪৬

৩। '' রাজর্ষি'' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — পৃ: ১১০
রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড
প: বঙ্গ সরকার
প্রকাশ অক্টোবর ১৯৬৫

৪। ঐ — ঐ — পৃ: ১৭৮ - ১৭৯

৫। ''চোখের বালি'' — ঐ — পৃ: ২১৬
রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তম খণ্ড
প: বঙ্গ সরকার

৬। '' হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'' — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃ: ২৮৩
তারাশঙ্কর রচনাবলী,
সপ্তম খণ্ড,
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা: লি:

৭। '' হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'' — ঐ — পৃ: ২১১
গ্রন্থপ্রকাশ,
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা

৮। '' উপন্যাসের শৈলী'' সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩	আশিস কুমার দে	পৃঃ ৭
৯। '' হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'' গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃঃ ১৬
১০। '' উপন্যাসের শৈলী'' সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩	আশিস কুমার দে	পৃঃ ১২১
১১। '' পদ্মানদীর মাঝি'' মানিক গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড, বিঃ সংস্করণ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃঃ ১২৭
১২। '' ত্রিবেণী'' ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিমিটেড, বৈশাখ, ১৩৬২	অনুরূপা দেবী	পৃঃ ১১ - ১২
১২(ক) '' উল্কা'' মডঃফরপুর, ১৩২২	অনুরূপা দেবী	পৃঃ ৬০
১২(খ) ''আরণ্যক'' পূর্বে দ্রষ্টব্য	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃঃ ২০০ - ২০১
১৩। '' সাজঙ্গী '' (দ্রষ্টব্যঃঅনুরূপা দেবী রচিত ''উল্কা'' গ্রন্থে '' উল্কা'' এবং ''সাজঙ্গী'' দুটি উপন্যাস বর্ণিত হয়েছে)	অনুরূপা দেবী	পৃঃ ১৩৩

১৪। '' পদ্মানদীর মাঝি'' মানিক পৃ: ১৮
সূর্বে দ্রষ্টব্য বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫। '' সাহিত্য চিন্তা'' বঙ্কিমচন্দ্র পৃ: ৩০
শ্রী প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত চট্টোপাধ্যায়
অমর সাহিত্য প্রকাশন

১৬। '' আশরী, চরিত্র ও শ্রী শংকর ঘোষ পৃ: ৩০
চেতনায়'',
জানুয়ারী ১৯৮৫

১৭। '' উপন্যাসের শৈলী'' আশিস কুমার দে পৃ: ৮
সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

১৮। ''দারিয়া'' পাঁচকড়ি পৃ: ৬
বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯। ঐ ঐ পৃ: ৭৮

২০। শ্রীকান্ত - প্রথম খণ্ড শরৎচন্দ্র পৃ: ১০৪
শরৎ রচনাবলী চট্টোপাধ্যায়
এম সি সরকার অ্যান্ড সনস্

২১। শ্রীকান্ত - দ্বিতীয় খণ্ড ঐ পৃ: ৬
ঐ

২২। ''অমরসিংহ '' নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পৃ:৩০১
নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের
রচনাবলী

২৩। ''কোষ্ঠীর ফলাফল'' কেদারনাথ পৃ: ৭
সূর্বে দ্রষ্টব্য বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪।	''কোষ্ঠীর ফলাফল'' পূর্বে দ্রষ্টব্য	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ: ৭
২৫।	ঐ	ঐ	পৃ: ১৮
২৬।	ঐ	ঐ	পৃ: ১১
২৭।	ঐ	ঐ	পৃ: ১৩ - ১৫
২৮।	''হিন্দের নিকেশ'' প্রকাশক : শ্রী শক্তি-কুমার ভাদুড়ী দি বিহার সাহিত্য ভবন লি: ২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা - ৪, ভাদ্র - ১৩৫৮	ঐ	পৃ: ৪৮
২৯।	ঐ	ঐ	পৃ: ৫২
৩০।	''নবীন সন্ন্যাসী'' প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী - দ্বিতীয় খন্ড	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	পৃ: ২৭৮
৩১।	'' বিহারে বাংলা সাহিত্য'' অণিমা প্রকাশনী ১৩৮৭	ডঃ নন্দ দুলাল রায়	পৃ: ১০
৩২।	''রত্নদীপ'' প্রভাত গ্রন্থাবলী তৃতীয় খন্ড ডি, এম, লাইব্রেরী	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	পৃ: ১

৩৩।	''রত্নদীপ''	প্রভাতকুমার	পৃ: ১৭
	প্রভাত গ্রন্থাবলী	মুখোপাধ্যায়	
	তৃতীয় খণ্ড		
	ডি, এম, লাইব্রেরী		
৩৪।	স্বাধীন সন্ন্যাসী	ঐ	পৃ: ৩৫৩
	প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের		
	গ্রন্থাবলী - দ্বিতীয় খণ্ড		
৩৫।	ঐ	ঐ	পৃ: ৩৫২
৩৬।	''মনের মানুষ''	ঐ	পৃ: ২৩৪
৩৭।	'' প্রভাত কুমার :	ডঃ শিবেশকুমার	পৃ: ২৩৩
	জীবন ও সাহিত্য''	চট্টোপাধ্যায়	
৩৮।	''আরণ্যক ''	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ: ১১২
	বিভূতি রচনাবলী		
	দ্বিতীয় খণ্ড		
	মূলত সংস্করণ		
৩৯।	ঐ	ঐ	পৃ: ৪৩
৪০।	ঐ	ঐ	পৃ: ১১
৪১।	ঐ	ঐ	পৃ: ৩১
৪২।	ঐ	ঐ	পৃ: ৩১
৪৩।	ঐ	ঐ	পৃ: ১৩৮
৪৪।	স্বর্গাদপি গরীয়সী	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	পৃ: ১২৪
	দ্বিতীয় খণ্ড		

৪৫। স্বর্গাদপি গরীয়সী — বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় — পৃঃ ১২৪
দ্বিতীয় খণ্ড

৪৬। ঐ — ঐ — পৃঃ ১০৪

৪৭। ঐ — ঐ — পৃঃ ১০৬

৪৮। 'অযাচী সন্ধানে' — ঐ — পৃঃ ৪৮
শারদীয় দেশ -
১৩১৫ সাল

৪৯। 'কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি' — ঐ — পৃঃ ৩৭৮
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
রচনাবলী - প্রথম খণ্ড,
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স

৫০। ''অযাচী সন্ধানে'' — ঐ — পৃঃ ৬০ - ৬১
শারদীয় দেশ - ১৩১৫ সাল

৫০(ক)। ''কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি'' — ঐ — পৃঃ ৪০৫

৫১। ''মৃগয়া'' — বনফুল — পৃঃ ৭১
বনফুল রচনাবলী
তৃতীয় খণ্ড

৫২। ঐ — ঐ — পৃঃ ১৩৬

৫৩। ''সতীনাথ - জীবন — ডঃ সন্তোষ কুমার — পৃঃ ৪৭
ও সাহিত্য'' মজুমদার
করুণা প্রকাশণী, কলি - ১,
প্রথম প্রকাশ - ১৩৯২

৫৪। '' হাটেবাজারে'' বনফুল পৃ: ১
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
পাবলিশিং কোং প্রা: লি:

৫৫। '' হাটেবাজারে'' ঐ পৃ: ৩৮
বনফুল রচনাবলী - পঞ্চদশ খণ্ড
গ্রন্থালয় লি:, কলিকাতা - ৭৩
১৩৮২

৫৬। ''হাটেবাজারে'' ঐ পৃ: ৬৭
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
প্রা: লি:

৫৭। ''হাটেবাজারে'' ঐ পৃ: ৪৬ - ৪৭
বনফুল রচনাবলী -
পঞ্চদশ খণ্ড ।

৫৮। '' হাটেবাজারে'' ঐ পৃ: ৭৬
বনফুল রচনাবলী
পঞ্চদশ খণ্ড ,
গ্রন্থালয় লি:, ১৩৮২

৫৯। ঐ ঐ পৃ: ৫৫

৬০। ঐ ঐ পৃ: ৫৫

৬১। 'অধিকাল' বনফুল পৃ: ২৯
বনফুল রচনাবলী
অষ্টাদশ খণ্ড

৬২। ঐ ঐ পৃ: ৩১

৬৩।	'অধিকলান'	বনফুল	পৃ: ৩০
	বনফুল রচনাবলী		
	অষ্টাদশ খণ্ড		
৬৪।	''ভুবন সোম''	ঐ	পৃ: ৩১
৬৫।	ঐ	ঐ	পৃ: ৩১
৬৬।	''ভুবন সোম''	ঐ	পৃ: ৫৮ -৫১
	বনফুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড		
	গ্রন্থালয় প্রা:লি:		
	কলিকাতা - ৭৩		
৬৭।	'' অধিকলান ''	ঐ	পৃ: ৪০
	বনফুল রচনাবলী ,		
	অষ্টাদশ খণ্ড		
৬৮।	''বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে''	অশোক কুমার দে	পৃ: ১৩৪
	জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৪		
৬৯।	'' Introduction to the Science of Language"	Sayee	Page - 316
	Vol. I.		
৭০।	''সতীনাথ, জীবন ও সাহিত্য''	ড: সন্তোষ কুমার মজুমদার	পৃ: ৭২
৭১।	''জাগরী''	সতীনাথ ভাদুড়ী	পৃ: ২
	সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১		
	সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ ।। নির্মাল্য আচার্য্য,		
	জানুয়ারী, ১৯৭৫		

৭২। '' জাগরী '' সতীনাথ ভাদুড়ী পৃ: ২২
সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১
সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ ।।
নির্মাল্য আচার্য,
জানুয়ারী, ১৯৭৫

৭৩। '' জাগরী'' ঐ পৃ: ৩৭
পূর্বে দ্রষ্টব্য

৭৪। ঐ ঐ পৃ: ৩৭

৭৫। ঐ ঐ পৃ: ৫১

৭৬। ঐ ঐ পৃ: ১১

৭৭। ঐ ঐ পৃ: ১৪১

৭৮। 'সতীনাথ, জীবন ও সাহিত্য' ড: সন্তোষকুমার মজুমদার পৃ: ৫৩
পূর্বে দ্রষ্টব্য

৭৯। ''ঢোঁড়াইচরিত - মানস' সতীনাথ ভাদুড়ী পৃ: ১ - ২
প্রথম চরণ,
সতীনাথ গ্রন্থাবলী ২
সম্পাদনা - শঙ্খ ঘোষ ।।
নির্মাল্য আচার্য
অক্টোবর ১৯৭৭

৮০। ঐ ঐ পৃ: ১

৮১। ঐ ঐ পৃ: ২৩

৮২।	''ঢোঁড়াইচরিত - মানস' প্রথম চরণ, সতীনাথ গ্রন্থাবলী ২, সম্পাদনা - শঙ্খ ঘোষ।। নির্মাল্য আচার্য, অক্টোবর ১৯৭৭	সতীনাথ ভাদুড়ী	পৃ: ৩৫ - ৩৬
৮৩।	''অচিন রাগিনী'' সতীনাথ গ্রন্থাবলী ৩	ঐ	পৃ: ১১৩
৮৪।	'' নাগলতা'' প্রথমা - সুবোধ ঘোষ প্রাইমা পাবলিকেশন, ১৩৯১	সুবোধ ঘোষ	পৃ: ২৯
৮৫।	''শতকিয়া'' আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলিকাতা -৯, তৃতীয় সংস্করণ	ঐ	পৃ: ১০১
৮৬।	ঐ	ঐ	পৃ: ২৩৫
৮৭।	ঐ	ঐ	পৃ: ২৩৮
৮৮।	ঐ	ঐ	পৃ: ৩২৬
৮৯।	ঐ	ঐ	পৃ: ৩৪০
৯০।	ঐ	ঐ	পৃ: ৩৫৯
৯১।	''বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'' - ১৯৮৮	ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ: ৬৬২

১২।	''সাক্ষাৎকার - বিমল কর'' দেশ ৩রা নভেম্বর, ১৯৯০	প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	পৃ:
১৩।	'' খড়কুটো''	বিমল কর	পৃ: ৩
১৪।	'' হ্রদ ''	ঐ	পৃ: ১৩
১৫।	'' খড়কুটো''	ঐ	পৃ: ১৪
১৬।	'' পূর্ণ -অপূর্ণ''	ঐ	পৃ: ১৫
১৭।	''অমরসিংহ'' পূর্ব দ্রষ্টব্য	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	পৃ: ৩১০
১৮।	' বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ উপন্যাসিকবৃন্দ'' (পি এইচ ডি - থিসিস, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৭)	ড: রামদুলাল বসু	পৃ: ৩২৭
১৯।	'বন্ধু (উপন্যাস সংগ্রহ)	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	পৃ: ৩০
১০০।	ঐ	ঐ	পৃ: ৩৪
১০১।	ঐ	ঐ	পৃ: ৩৫
১০২।	ঐ	ঐ	পৃ: ৫৩
১০৩।	''নবীন সন্ন্যাসী'' পূর্ব দ্রষ্টব্য	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	পৃ: ৪৭৩
১০৪।	ঐ	ঐ	পৃ: ৪৭৩

১০৫। ''মৃগয়া''
বনফুল রচনাবলী,
১০৬। তৃতীয় খণ্ড,
গ্রন্থালয় প্রা:লি:
১০৭।
বনফুল পৃ: ৬১

১০৮। '' তীর্থের কাক''
অ্যাসোসিয়েটেড
পাবলিশিং কোংপ্রা:লি:
১৩, মহাত্মা গান্ধী
রোড, কলিকাতা - ৭
জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮ শকাব্দ
ঐ পৃ: ১৫৭

১০৯। '' দ্বৈরথ ''
বনফুল রচনাবলী -
প্রথম খণ্ড,
বিশেষ সংস্করণ
গ্রন্থালয় প্রা: লি:
ঐ পৃ: ১৫৪

১১০। ঐ ঐ পৃ: ১৭২

১১১। ঐ ঐ পৃ: ২১৮

১১২। ''অযাচক সন্ধানে''
শারদীয় দেশ - ১৩৯৫
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় পৃ: ৫১

১১৩। ''স্বর্গাদপি গরীয়সী''
তৃতীয় খণ্ড,
মিত্র ও ঘোষ,
প্রথম 'মিত্র - ঘোষ'
সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭০
ঐ পৃ: ৮২

১১৪। ''শতকিয়া'' সুবোধ ঘোষ পৃ: ৫০
আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:
কলিকাতা ৯,
তৃতীয় সংস্করণ

১১৫। ঐ ঐ পৃ: ১৮৮

১১৬। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' (প্রথম চরণ) সতীনাথ ভাদুড়ী পৃ: ৬
সতীনাথ গ্রন্থাবলী ২

১১৭। ঐ ঐ পৃ: ৪

১১৮। ঐ ঐ পৃ: ১১৩-১১৪

১১৯। ঐ ঐ পৃ: ১১৪

১২০। ''ঢোঁড়াইচরিত মানস সতীনাথ ভাদুড়ী পৃ: ১৪২-১৪৩
প্রথম চরণ''
পূর্ব দ্রষ্টব্য

১২১। ''শতকিয়া'' সুবোধ ঘোষ পৃ: ১৮০
আনন্দ পাবলিশার্স
প্রা:লি:, তৃতীয় সংস্করণ
- ১৩৭১

----- • -----